বাংলা সাহিত্য: মধ্যযুগের সাহিত্য

- বাংলা সাহিত্য: মধ্যযুগ- ১ম ভাগ
- বিগত বছরের বিসিএস প্রশ্নাবলি
- অন্ধকার যুগ
- নাথসাহিত্য
- অবক্ষয় যুগ
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য
- মঙ্গলকাব্য
- বৈষ্ণব পদাবলি
- শ্রীচৈতন্য দেব ও জীবনী সাহিত্য:

বিগত BCS প্রশ্নাবলী

০১) অন্ধকার যুগের সাহিত্যের নিদর্শন সম্পর্কে আলোচনা করুন। (৩৭তম BCS)
০২) কোন তিন কবির নাম যথাক্রমে কবিকণ্ঠহার, কবিকঙ্কন ও রায়গুণাকর। (৩৩তম BCS)
০৩) নাথসাহিত্য কাকে বলে? এ সাহিত্যের প্রধান কবি কে? (৩০তম BCS)
০৪) জয়দেব রচিত একটি সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থের নাম লিখুন, যা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। (১৩তম BCS)
০৫) 'গোরক্ষ বিজয়'-এর আদি কবির নাম কি? (১১তম BCS)

আলোচ্য বিষয়

মধ্যযুগের সাহিত্য : গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

০১) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মধ্যযুগকে কীভাবে ভাগ করেছেন?
০২) মধ্যযুগের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য লিখুন।
০৩) 'অন্ধকার যুগ' বলতে কী বোঝানো হয়?
০৪) 'শূন্যপুরাণ' কোন ধরনের গ্রন্থ?
০৫) 'সেক শুভোদয়া' কার লেখা?
০৬) নাথধর্মের প্রতিষ্ঠাতা কে? আলোচনা করুন।
০৭) নাথসাহিত্য কী? আলোচনা করুন।
০৮) 'গোরক্ষ বিজয়' কাব্যের কবির নাম লিখুন।

বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের শুরুতেই অর্থাৎ ১২০১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে 'অন্ধকার যুগ' হিসেবে অভিহিত করা হয়। এই সময়ে বাংলা সাহিত্যের লিখিত উল্লেখযোগ্য কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না। ধারণা করা হয় তুর্কি বিজয়ের ফলে মুসলিম শাসনামলের সূচনার পটভূমিতে নানা অস্থিরতার কারণে এ সময়ে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি। তবে কোনো কোনো সাহিত্যিকের মতে, এ সময়ে উল্লেখযোগ্য কোনো সাহিত্য পাওয়া না গেলেও 'শূন্যপুরাণ', ও 'সেক শুভোদয়া'র মতো কিছু অপ্রধান সাহিত্য রচিত হয়েছিল। তাই তারা এ সময়কে অন্ধকার যুগ হিসেবে মেনে নিতে চান না।

প্রকৃতপক্ষে বাংলা সাহিত্যবর্জিত তথাকথিত অন্ধকার যুগের জন্য তুর্কিবিজয় ও তার ধ্বংসলীলাকে দায়ী করা বিভ্রান্তিকর। এ সময়ের যেসব সাহিত্য নির্দশন মিলেছে এবং এ সময়ের রাজনৈতিক অবস্থার যেসব তথ্য লাভ করা গেছে তাতে অন্ধকার যুগের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না।

ড. আহমদ শরীফ তথাকথিত অন্ধকার যুগে বাংলা সাহিত্যের কোনো নির্দশন না পাওয়ার কারণগুলো এভাবে চিহ্নিত করেছেন:

ক. ধর্মমত প্রচারের কিংবা রাজ্যশাসনের বাহন হয়নি বলে বাংলা তুর্কি বিজয়ের পূর্বে লেখ্য ভাষার মর্যাদা পায়নি।

খ. তের-চৌদ্দ শতক অবধি বাংলা ভাষা উচ্চবিত্তের সাহিত্য রচনার যোগ্য হয়ে ওঠেনি।

গ. সংস্কৃততর কোনো ভাষাতেই রসসাহিত্য চৌদ্দ শতকের পূর্বে রচিত হয় নি। তুর্কি বিজয়ের পর প্রাকৃতজনেরা প্রশ্রয় পেয়ে বাংলা রচনা করেছে মুখে মুখে। তাই লিখিত সাহিত্য অনেক কাল গড়ে ওঠেনি।

ঘ. তের-চৌদ্দ শতকে সংস্কৃত চর্চার কেন্দ্র ছিল হিন্দু শাসিত মিথিলায়; তাই এ সময় বাংলাদেশে সংস্কৃত চর্চা বিশেষ হয়নি।

ঙ. আলোচ্য যুগে বাংলায় কিছু পুঁথিপত্র রচিত হলেও জনপ্রিয়তার অভাবে, ভাষার বিবর্তনে এবং অনুলিপিকরণের গরজ ও আগ্রহের অভাবে তা নষ্ট হয়েছে। আগুন-পানি-উই-কীট তো রয়েছেই।

চ. লিখিত হলেও কালে লুপ্ত হওয়ার বড় প্রমাণ চর্যাগীতি, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, সেক শুভোদয়া প্রভৃতির একাধিক পাণ্ডুলিপির অভাব।

ছ. চর্যাগীতি রচনার শেষ সীমা যদি বার শতক হয়, তাহলে তের-চৌদ্দ শতক বাংলা ভাষার গঠন-যুগ তথা স্বরূপ প্রাপ্তির যুগ। কাজেই এ সময়কার কোনো লিখিত রচনা না থাকারই কথা।

জ. দেশজ মুসলমানের ভাষা চিরকালই বাংলা। বাংলায় লেখ্য রচনার রেওয়াজ থাকলে তুর্কিবিজয়ের পূর্বের বা পরের মুসলমানের রচনা নষ্ট হওয়ার কারণ ছিল না।

এসব কারণে পণ্ডিতগণ মনে করেন তথাকথিত অন্ধকার চিহ্নিত করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। তাই ১২০০ খ্রিস্টাব্দ থেকেই মধ্যযুগ শুরু হয়েছে মনে করা সমীচীন। এ সময় থেকে অপরিণত রূপের প্রাথমিক পর্যায় থেকে ক্রমান্বয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য উৎকর্ষের পথে অগ্রসর হয়েছে। পূর্বাপর নির্দশন ও বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে বাংলা সাহিত্যে যে ধারাবাহিকতা প্রত্যক্ষ করা যায়, তাতে অন্ধকার যুগের দাবি সহজেই উপেক্ষা করা চলে।

শূন্যপুরাণ

রামাই পণ্ডিত রচিত ধর্মপূজার শাস্ত্রগ্রন্থ 'শূন্যপুরাণ'। রামাই পণ্ডিতের কাল ত্রয়োদশ শতক বলে অনুমিত হয়। শূন্যপুরাণ ধর্মীয় তত্ত্বের গ্রন্থ-গদ্যপদ্য মিশ্রিত চম্পুকাব্য। বৌদ্ধধর্মের ধ্বংসোন্মুখ অবস্থায় হিন্দুধর্মের সঙ্গে মিলন সাধনের জন্য রামাই পণ্ডিত ধর্মপূজার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এতে বৌদ্ধদের শূন্যবাদ এবং হিন্দুদের লৌকিক ধর্মের মিশ্রণ ঘটেছে। শূন্যপুরাণে এর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থের অর্ন্তগত 'নিরঞ্জনের উষ্মা' কবিতাটি থেকে প্রমাণিত হয়, এটি মুসলমান তুর্কি কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের পরের, অন্তত ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিকের রচনা।

সেক শুভোদয়া

রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাপতি হলায়ুধ মিশ্র রচিত 'সেব শুভোদয়া' সংস্কৃত গদ্যপদ্যে লেখা চম্পুকাব্য। ড. মুহম্মদ এনামুল হকের মতে, 'সেক শুভোদয়া' খ্রিস্ট্রীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর একেবারেই গোড়ার দিককার রচনা।' গ্রন্থটি রাজা লক্ষ্মণ সেন ও শেখ জালালুদ্দীন তাবরেজির আলৌকিক কাহিনি অবলম্বনে রচিত। শেখের শুভোদয় অর্থাৎ শেখের গৌরব ব্যাখ্যাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। এতে নানা ঘটনার মাধ্যমে মুসলমান দরবেশের চরিত্র ও অধ্যাত্মশক্তির পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এ গ্রন্থে প্রাচীন বাংলার যে সব নিদর্শন আছে তা হলো পীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক বাংলা ছড়া বা আর্যা, খনার বচন ও ভাটিয়ালি রাগের একটি প্রেমসঙ্গীত। আর্যার সংখ্যা তিনটি এবং এগুলো বাংলা ভাষায় প্রাপ্ত পীর মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক কাব্যের প্রাচীন নিদর্শন।

নাথ সাহিত্য

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে নাথধর্মের কাহিনি অবলম্বনে রচিত আখ্যান কাব্য নাথসাহিত্য নামে পরিচিত। এ দেশে প্রাচীনকাল থেকে শিব উপাসক এক শ্রেণির যোগী সম্প্রদায় ছিল, তাঁদের আচরিত ধর্মের নাম নাথধর্ম। হাজার বছর আগে ভারত জুড়ে এ সম্প্রদায়ের খ্যাতি ছিল। তাঁদের গতিবিধির ব্যাপকতার জন্য সারা ভারতে তাঁদের কীর্তি ও কাহিনি ছড়িয়ে আছে। নাথ অর্থ প্রভু, দীক্ষান্তে এই নাথ পদবী তাঁরা নামের শেষে যুক্ত করতেন। অলৌকিক ক্ষমতায় তাঁরা ছিলেন সিদ্ধ। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে শৈবধর্ম মিশে এ ধর্মমতের উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে করা হয়। বিশেষ সাধনপ্রক্রিয়া দ্বারা মোক্ষ লাভ করা এ ধর্মাবলম্বীদের লক্ষ্য।

শিবকে তাঁরা আদিগুরু বলে বিবেচনা করেন। তাই শিব হলেন আদিনাথ। তাঁর শিষ্য মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ। এই মীননাথই নাথধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। মীননাথের শিষ্য গোরক্ষনাথ। শিবের অপর শিষ্য হাড়িপা বা জালন্ধরিপা এবং হাড়িপার শিষ্য গোরক্ষনাথ। শিবের অপর শিষ্য হাড়িপা বা জালন্ধরিপা এবং হাড়িপার শিষ্য হলেন কানুপা বা কাহ্নপাদ। এই চারজন সিদ্ধাচার্যের মাহাত্ম্যসূচক অলৌকিক কাহিনি অবলম্বনেই নাথসাহিত্যের বিকাশ ঘটেছে।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথের সময় সপ্তম শতকের মধ্যভাগে মনে করেন। অবশ্য এ সম্পর্কে মতানৈক্য থাকলেও দশম-একাদশ শতকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নাথাচার্যদের আবির্ভাব ঘটেছিল বলে অনুমান করা হয়। এ সময়ই নাথধর্ম বিকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক যুগ হিসেবে চিহ্নিত। অষ্টাদশ শতকের আগে লেখা নাথসাহিত্যের কোন পুঁথি পাওয়া যায়নি।

নাথসাহিত্যের কাল সম্পর্কে ড. আহমদ শরীফ মন্তব্য করেছেন, 'আদিনাথ-মীননাথ কাহিনির শুরু আট শতকে এবং মীননাথ-গোরক্ষনাথ কিংবা হাড়িপা-কানুপার কাহিনির উদ্ভব তার পরে পরেই। এঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকলেও মাণিকচাঁদ ময়নামতী গোপীচাঁদ কাহিনি দশ শতকের আগেকার নয়। অতএব, আট-দশ শতকে কায়া সাধনার রূপক কাহিনি মুখে মুখে চালু ছিল। ষোল শতকের মীননাথ-গোরক্ষনাথ কাহিনি 'গোরক্ষবিজয়' রূপে লিখিত রূপ পায়। গোপীচাঁদ গানও সতের আঠার শতকে লিখিত পাঁচালীতে স্থিতি পায়, কিন্তু মাণিক-ময়নামতী গাঁথা লোকসাহিত্য রূপে বিশ শতকেই সংগৃহীত ও মুদ্রিত হয়।' মৌখিক নাথসাহিত্যের ভাষা আঞ্চলিক ও আধুনিক।

নাথ সাহিত্য আদিনাথ শিব, পার্বতী, মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িপা, কানুপা, ময়নামতী ও গোপীচন্দ্রের কাহিনি স্থান পেয়েছে। এ সব কাহিনি দু ভাবে বিভক্ত; একটিতে আছে সিদ্ধদের ইতিহাস এবং গোরক্ষনাথ কর্তৃক মীননাথকে নারীমোহ থেকে উদ্ধার; অপরভাগে আছে রানি ময়নামতী ও তাঁর পুত্র গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্রের কাহিনি। প্রথমটি গোরক্ষবিজয়, অপরটি ময়নামতী বা গোপীচন্দ্রের গান নামে পরিচত। প্রথমটিতে ধর্মীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠা প্রাধান্য পেয়েছে। অপরটিতে ধর্মীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠার চেয়ে কাব্যগুণ প্রাধান্য লাভ করেছে।

নাথসাহিত্যের কবিগণ

নাথধর্ম সংক্রান্ত গল্পকাহিনি নিয়ে যেসব সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে তা দীর্ঘদিন পর্যন্ত লোকচক্ষুর অন্তরালেই ছিল। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে প্রথমবার স্যার জর্জ গ্রীয়ার্সন রংপুর থেকে সংগৃহীত একটি গীতিকা 'মাণিকচন্দ্র রাজার গান' নাম দিয়ে এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে উত্তর ও পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে 'ময়নামতীর গান', 'গোপীচন্দ্রের গান', গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস' ইত্যাদি বিভিন্ন নামে একই কাহিনীভিত্তিক পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছে। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ শেখ ফয়জুল্লাকৃত 'গোরক্ষবিজয়' কাব্যের পুথি আবিষ্কার করে প্রকাশ করেছেন।

➘ গোরক্ষনাথ-মীননাথের কাহিনি অবলম্বনে রচিত যে সব কাব্য সম্পাদিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে সেগুলো হলো:

১. আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত কবি শেখ ফয়জুল্লার 'গোরক্ষবিজয়',

২. ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত কবি শ্যামদাস সেনের 'মীনচৈতন' এবং

৩. ড. পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত কবি ভীম সেনের 'গোর্খবিজয়'।

এই তিনটি কাব্যের কবিরা স্বতন্ত্র না একই ব্যক্তি- এ সম্পর্কে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ

মধ্যযুগের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য

১) সাহিত্য রচনায় দেব-দেবীর প্রাধান্য। তবে মানুষের কথাও অস্বীকৃত হয়নি।
২) এ সময়ের সাহিত্যে সংস্কৃতবহুল শব্দ ব্যবহার যেমন ব্যাপক স্থান জুড়ে আছে, তেমনি আছে আরবি-ফারসি শব্দ মিশ্রিত ভাষার পরিচয়।
৩) মধ্যযুগের সাহিত্য পদ্য ও নীতি নির্ভর; গদ্য সাহিত্য তখনও প্রসারতা পায়নি।
৪) এ যুগের সাহিত্য প্রধানত ধর্মীয় বিষয়াবলম্বনেই রচিত। এক্ষেত্রে হিন্দু ধর্মের প্রাধান্য বেশি পরিলক্ষিত হয়।
৫) মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রধান অংশেই অনুবাদ, মৌলিক রচনা অল্পই আছে।

মধ্যযুগের সাহিত্যের বিষয়বস্তু

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য প্রধানত ধর্মীয় বিষয়াবলম্বনেই রচিত। অবশ্য বিশ্বের অপরাপর সাহিত্যেও এ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। ড. দীনেশচন্দ্র সেন বাংলা সাহিত্যের এ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে মন্তব্য করেছেন, 'ধর্মকলহে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের ইতিহাস প্রধানত হিন্দুধর্মের বিভিন্ন বিষয়বস্তু অবলম্বনেই সমৃদ্ধ হয়েছে। এ সময়ে মুসলমান কবিগণও ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে জনগণের অজ্ঞতা দূর করার জন্য ধর্মীয় কাব্য রচনা করেছিলেন। মধ্যযুগে প্রণয়োপাখ্যান রচনা করে মুসলমান কবিগণ এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করেন। তার পাশাপাশি মুসলমান কবিগণ ধর্মীয় বিষয়ের অনুবাদ করে ধর্মসাহিত্যের বিকাশ ঘটিয়েছিলেন। তাঁদের রচনায় ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন দিক প্রতিফলিত হয়ে জনগণকে ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছে।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ছিল ধর্মীয় বিষয়বস্তু দ্বারা প্রভাবিত। দেব-দেবীর লীলামাহাত্ম্যের আড়ালে ঢাকা পড়ে যায় মানুষের জীবন। পক্ষান্তরে, আধুনিক যুগের সাহিত্যে গুরুত্ব পেয়েছে ব্যক্তিমর্যাদা, প্রেম-ভালোবাসা, ব্যক্তিসত্তা, রোমান্টিকতা, সমাজ-সচেতনতা, দেশপ্রেম, মৌলিকতা ও মুক্তবুদ্ধি।

পৃষ্ঠপোষকতা

গৌড়ের সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতির প্রমাণ মিলবে তখনকার কবিদের রচিত বিভিন্ন রাজপ্রশস্তিতে। ড. ওয়াকিল আহমদ তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত' গ্রন্থ এর একটি তালিকা দিয়েছেন।

বঙ্গের সুলতান		কবি	কাব্য
গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ	(১৩৮৯-১৪১০)	শাহ মুহম্মদ সগীর	ইউসুফ-জোলেখা
জালালুদ্দিন মুহম্মদ শাহ	(১৪১৮-৩১)	কৃত্তিবাস	রামায়ণ
রুকনউদ্দিন বরবক শাহ	(১৪৫৯-৭৪)	মালাধর বসু	শ্রীকৃষ্ণবিজয়
শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ	(১৪৭৪-৮১)	জৈনুদ্দিন	রসুলবিজয়
আলাউদ্দিন হুসেন শাহ	(১৪৯৩-১৫১৯	বিজয় গুপ্ত	মনসামঙ্গল
নাসিরুদ্দিন নসরত শাহ	(১৫১৯-৩১)	বিপ্রদাস	মনসাবিজয়
আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ	(১৫৩২-৩৩)	বিদ্যাপতি	বৈষ্ণবপদ
		শ্রীধর	বিদ্যাসুন্দর

মুসলমান শাসকের আন্তরিক পৃষ্ঠপোষকতার ফলে বাংলা সাহিত্য সৃষ্টিমুখর হয়ে উঠেছিল।

অবক্ষয় যুগ

ভারতচন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পর থেকে আধুনিকতার যথার্থ অর্থাৎ ১৭৬০ থেকে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত সময়ের বাংলা সাহিত্যে সৃষ্টির স্বল্পতা, রচনার পরিবেশ-পরিস্থিতি ও বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে এই পর্যায়কে একটা স্বতন্ত্র যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কারও মতে এই যুগের পরিধি ১৭৬০ থেকে ১৮৩০ সাল, অর্থাৎ কবি ঈশ্বর গুপ্তের আবির্ভাব-পূর্বকাল পর্যন্ত নির্ধারণ করার পক্ষপাতী। মধ্যযুগের শেষ আর আধুনিক যুগের শুরুর এই সময়টুকুকে 'অবক্ষয় যুগ' বলা হয়েছে। মধ্যযুগের উজ্জ্বল সাহিত্যসৃষ্টির পরে এই যুগে শিথিল ভাবালুতা, অশিষ্ট কাব্যালাপ, অশ্লীল রসপরিবেশনে যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে তাতে তাকে 'অবক্ষয় যুগ' বলাই সমীচীন। অনেকে এ সময়কালকে 'যুগ সন্ধিক্ষণ' বলেন।

বাংলা সাহিত্য : মধ্যযুগ | মধ্যযুগের সাহিত্য : শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য

বিগত BCS প্রশ্নাবলী

০১. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে গ্রামীণ জীবনের কী পরিচয় পাওয় যায় তা লিখুন। (৩৬তম BCS)
০২. 'চণ্ডীদাস সমস্যা' কী? (৩৪তম BCS)
০৩. বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যের নাম কী? (৩৩, ২২, ২০, ১০তম BCS)
০৪. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের রচয়িতা সম্পর্কে ধারণা দিন।/বড়ু চণ্ডীদাসের পরিচয় দিন। (৩১, ২৯তম BCS)
০৫. উপাধিসহ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের আবিষ্কারকের পূর্ণনাম লিখুন। (২৫তম BCS)
০৬. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যটির রচয়িতা কে? এর রচনাকাল ও গুরুত্ব কী? (১৫তম BCS)

আলোচ্য বিষয়

মধ্যযুগের সাহিত্য : শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

০১) 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
০২) বড়ু চণ্ডীদাসের পরিচয় দিন।
০৩) 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের তেরটি খণ্ডের নাম লিখুন।
০৪) 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের নামকরণ সম্পর্কে পণ্ডিতদের মত বিশ্লেষণ করুন।
০৫) 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের প্রধান চরিত্রের পরিচয় দিন।
০৬) বড়াই কে? বড়াইর পরিচয় দিন।
০৭) বসন্তরঞ্জন রায় সম্বন্ধে যা জানুন লিখুন।
০৮) চণ্ডীদাস সমস্যা আলোচনা করুন।

STUDENT STUDY মধ্যযুগের সাহিত্য : শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'মধ্যযুগের প্রথম কাব্য এবং বড়ুচণ্ডীদাস মধ্যযুগের আদি কবি। ভাগবত পুরাণের কৃষ্ণলীলা-সম্পর্কিত কাহিনি অনুসরণে, সংস্কৃত কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যের প্রভাব স্বীকার করে, লোকসমাজে প্রচলিত রাধাকৃষ্ণের প্রেম-সম্পর্কিত গ্রাম্য গল্প অবলম্বনে কবি বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য রচনা করেন।

১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে (১৩১৬ বঙ্গাব্দ) বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ পশ্চিমবঙ্গের বাকুড়া জেলার কাঁকিল্যা গ্রামে এক গৃহস্থ বাড়ির গোয়ালঘর থেকে পুঁথি আকারে অযত্নে রক্ষিত এ কাব্য আবিষ্কার করে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন অধ্যায়ের সংযোজন ঘটায়। বৈষ্ণব মহান্ত শ্রীনিবাস আচার্যের দৌহিত্র বংশজাত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অধিকারে এই পুঁথিটি রক্ষিত ছিল। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে (১৩২৩ সনে) বসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় পুঁথিটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

পুঁথিটির প্রথম দিকের দুটি পাতা এবং শেষের পাতাটি ছিল না। এ ছাড়া পুঁথির মধ্যে মধ্যেও কিছু পাতা নেই। রীতি অনুযায়ী পুঁথির প্রথম দিকে দেবতার প্রশংসা, কবির পরিচয় ও গ্রন্থনাম উল্লিখিত হয় এবং শেষ দিকের পাতায় পুঁথির রচনাকাল ও লিপিকাল লিখিত থাকে। প্রথম ও শেষ অংশ খণ্ডিত থাকায় কবির আত্মপরিচয় ও রচনাকালের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লোকচক্ষুর আড়ালেই রয়ে গেছে।

বৈষ্ণব মতবাদের গৃহীত রাধাকৃষ্ণের রূপকের বাইরে এ কাব্যের পরিচয়। বৈষ্ণব সাধনা ও ঐতিহ্যের বিরোধী এ কাব্য রুচিহীন গ্রাম্যতা, যৌনকামনা ও মিলনের বর্ণনায় অশ্লীল, সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতির ব্যঞ্জনার অভাব ও কাব্যকে করে তুলেছে বিতর্কমুখর। তাই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন হিসেবে কাব্যটি অচিরেই ব্যাপক কৌতূহলের সৃষ্টি করে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে খণ্ডিতপদসহ মোট পদের সংখ্যা ৪১৮টি। পুঁথিতে সংস্কৃত শ্লোক আছে ১৬১টি। পুঁথির পাতার সংখ্যা ২২৬, অতএব পৃষ্ঠা ৪৫২; এর মধ্যে মাঝের মোট ৪৫ পৃষ্ঠা পাওয়া যায়নি। ৪৫ পৃষ্ঠা বাদ গেলে পুঁথির প্রাপ্ত পৃষ্ঠার সংখ্যা ৪০৭। পুঁথির লিপি তিন হাতের লেখা। ৪১৮টি পদের মধ্যে কবির ভণিতা আছে ৪০৯টি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রচনাকাল

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচনাকাল নিয়ে বেশ মতবিরোধের সৃষ্টি হয়েছে। পুঁথিতে প্রাপ্ত চিরকুট ১০৮৯ বঙ্গাব্দের। সে হিসেবে ১৬৮২ খ্রিস্টাব্দে পুঁথিখানি বনবিষ্ণুপুরের রাজগ্রন্থাগারে সংগৃহীত ছিল। পুঁথিটি অবশ্যই এই চিরকুট অপেক্ষা প্রাচীনতম। ড. রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়ের

মতে, 'এই পুঁথি ১৩৫৮ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে সম্ভবত চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে লিখিত। ড. রাধাগোবিন্দ বসাকের ধারণা, 'পুঁথিখানির লিপিকাল ১৪৫০ থেকে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে।' যোগেশচন্দ্রের মতে, এ পুঁথির লিপিকাল ১৫০০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে নয়।' ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ড.রাধাগোবিন্দ বসাকের মত সমর্থন করেন। ড. সুকুমার সেনের মতে, 'কৃষ্ণকীর্তনের লিপিকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ।' শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের প্রাপ্ত পুঁথিটি কবির স্বহস্তলিখিত নয়-পরবর্তী এক বা একাধিক লিপিকারের লেখা। তাই এর রচনাকাল লিপিকালের পূর্বেকার। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এ কাব্যের ভাষাকে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বের বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। তাছাড়া রসবিচারে কাব্যটির ভাষা চৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী বলেও ধরা হয়েছে। বড়ু চণ্ডীদাস আদিমধ্যযুগ তথা চৈতন্যযুগের কবি। চৈতন্যদেবের জন্ম ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে। বড়ু চণ্ডীদাস আগেই কবিখ্যাতি লাভ করেছিলেন। জনশ্রুতি অনুসারে কবির জন্মকাল ১৩২৫ থেকে ১৪১৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। চণ্ডীদাস শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন তার সমর্থনে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বৈষ্ণব সাহিত্য থেকে তথ্য প্রমাণ করেছেন।

লিপি

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য চৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী কালের রচনা। অনুমান করা চলে চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কোনো সময়ে বড়ু চণ্ডীদাস জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ দিকে তাঁর কাব্য রচনা করেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথির লিপি ১৪৩৬ থেকে ১৫২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত লিপি অপেক্ষা প্রাচীন। তাঁর মতে এর লিপিকাল আনুমানিক ১৪০০ খ্রিস্টাব্দ। তিনি মনে করেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য ১৩৪০ থেকে ১৪৪০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রচিত।

নামকরণ

কাব্যটির প্রথম ও শেষাংশ খণ্ডিত ছিল বলে কাব্যের নাম ও কবির বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়নি। গ্রন্থের ভেতরে কবির ভণিতা থাকলেও কাব্যের নাম নেই। সম্পাদক কিংবদন্তি অনুসারে এবং কাব্যে কৃষ্ণলীলা সম্পর্কিত বিষয়বস্তু দেখে নামকরণ করেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।' তবে এই নাম যথার্থ নয়।

'কীর্তন' কথাটি নামকরণে সংযোজন পণ্ডিতদের আপত্তি। 'নাম রূপ ও গুণাদি সরবে উচ্চারণ করাই কীর্তন। ভক্তির সঙ্গে নাম গুণ ও লীলা কীর্তনই বৈষ্ণবচর্যা।' কবি বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যের উদ্দেশ্যে সভক্তি কীর্তন নয়। তাই ড. বিমানবিহারী মজুমদার মন্তব্য করেছেন, 'কীর্তন শব্দের একটি অর্থ হইতেছে কীর্তি, খ্যাতি ও যশ বিষয়ক স্তুতিগান। অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস কৃষ্ণের চরিত্রের সঙ্গে প্রেমের কোনো সম্বন্ধই নাই' সে শুধু আত্মতৃপ্তী চায়, সে নায়িকাকে শুধু গালাগালিই করে না, ফৌজদারি মোকর্দমার আসামীর মতো সে মায়ের বকুনি খাইয়া নায়িকার নামে দুরপনেয় কুৎসা ঘোষণা করে, তাহার মনে দয়া নাই, মায়া নাই, সে বহুবার নায়িকাকে উপভোগ করিয়াও তাহার দোষ-ত্রুটিই শেষ পর্যন্ত মনে রাখে এবং সে জন্য তাহাকে পরিত্যাগ করে। বসন্তরঞ্জন বাবুর আবিষ্কৃত খণ্ডিত পুঁথির নাম রাধাকৃষ্ণের ধামালী বলিলে অধিকতর সঙ্গত হয়।'

কালিদাস রায় বলেছেন, 'বলপ্রয়োগ, ভয়প্রদর্শন, গ্রাম্য ভাষা প্রয়োগ, বর্বরোচিত আচরণের সমাবেশে আলঙ্কারিক বিচারে এই কাব্যে রসাভাস ঘটেছে।' গোপাল হালদার বলেছেন, 'শ্রীকৃষ্ণ যতই আপনার দেবত্বের বড়াই করুক সে ধূর্ত এক গ্রাম্য লম্পট ছাড়া আর কিছুই নয়।'

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বারটি স্থানে ধামালী কথাটির প্রয়োগ আছে। এ প্রেক্ষিতে কাব্যটির নাম 'রাধাকৃষ্ণের ধামালী' হতে পারে বলে গবেষকগণ মনে করেন। পুঁথিতে প্রাপ্ত একটি চিরকুট অনুসারে এ কাব্যের প্রকৃত নাম 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ব্ব' (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ)।

বড়ু চণ্ডীদাস

কবির নাম বড়ু চণ্ডীদাস; কবি কাব্যের আদ্যন্ত বড়ু চণ্ডীদাস ভণিতা ব্যবহার করেছেন। কোথাও কোথাও চণ্ডীদাস ভণিতা আছে, সাত বার আছে অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস। সব ভণিতার সঙ্গে বাসলী দেবীর উল্লেখ করা হয়েছে। কবির নাম যে বড়ু চণ্ডীদাস তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ভণিতা থেকে অনুমতি হয় কবি শাক্তদেবী বাসলীর সেবক ছিলেন। বড় চণ্ডীদাস তাঁর কাব্যের ভাব, ভাষা, উপস্থাপনা পদ্ধতি ও রুচিবোধের যে স্বাতন্ত্র দেখিয়েছেন তার প্রেক্ষিতে তাঁকে পদাবলীর চণ্ডীদাস থেকে পৃথক কবি বলে বিবেচনা করা হয়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের কিছু অংশ খণ্ডিত বলে কবি বড়ু চণ্ডীদাস সম্পর্কে তেমন কিছুই জানা যায় নি। সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায়ের সংগৃহীত তথ্য অনুসারে কবির জন্মকাল ১৪০৩, ১৪১৭ অথবা ১৩৮৬ থেকে ১৪০০ খ্রিস্টাব্দের কোনো এক সময়। অন্য মতে ১৩২৫ খ্রিস্টাব্দ। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতানুসারে কবির জীবনকাল ১৩৭০ থেকে ১৪৩৩ খ্রিস্টাব্দ। যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে, ছাতনার রাজা হামির উত্তর ১৩৭৩ থেকে ১৪০৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এ সময়ে ছাতনার বড়ু চণ্ডীদাস বিদ্যমান ছিলেন।

বড়ু চণ্ডীদাসের আবির্ভাব স্থান সম্পর্কেও মতভেদ বিদ্যমান। কারও মতে তাঁর জন্মস্থান বীরভূমের নান্নুর, আবার কারও মতে বাঁকুড়ার ছাতনা। নান প্রবাদ, সহজিয়া গ্রন্থ প্রভৃতি অনুসারে বীরভূমের নান্নুর বাসলী দেবীর পীঠস্থান এবং চণ্ডীদাসের জন্মস্থান। আবার বাঁকুড়ার ছাতনা গ্রামে বাসলী দেবীর মন্দির ও চণ্ডীদাসের ভিটার প্রবাদও প্রচলিত আছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের ভাষা-বৈশিষ্ট্য

১. প্রাকৃত ও অপভ্রংশের উচ্চারণ দেখা যায়। শব্দের শুরুতে 'অ' ধ্বনির উচ্চারণ 'আ' হয়ে গেছে। যেমন-আনেক, আতি।
২. উদ্বৃত্তস্বর তখনও শব্দ শেষে অনেকটা রক্ষিত হত। যেমন-গাআ, জাইও।
৩. প্রাকৃত প্রভাবিত এক ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব রূপ সর্বনামে দৃষ্ট হয়। যেমন-আহ্ম, তোহ্মো।
৪. প্রাকৃত অপভ্রংশ প্রভাবিত আনুনাসিক উচ্চারণ ও বানানে চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার খুব বেশি হয়েছে। যেমন-কাহ্নাঁড়, দেবেঁ, দুধেঁ, করিআঁ।
৫. বিপ্রকর্ষ, স্বরসংগতি, যুক্তবর্ণের একটি লোপ ইত্যাদি ধ্বনিগত পরিবর্তন লক্ষিত হয়। যেমন-পরাণ, সেনেহ, বুধি (বুদ্ধি)।
৬. ভাষায় ঈ-কারান্তে স্ত্রীলিঙ্গের রূপ দেখা যায়। যেমন-কমলবদনী, কোঁঅলী পাতালী বালী।
৭. একবচন ও বহুবচনে একই রূপ ব্যবহৃত হয়েছে। বহুবচনে রা, রে, সবে, সব, জন, সঅল ইত্যাদি অনুসর্গের ব্যবহার।
৮. নামধাতুর যথেষ্ট ব্যবহার হয়েছে। যেমন-চুম্বিলা, মুকুলিল, চিন্তিল।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের চরিত্র

রাধা, কৃষ্ণ ও বড়াই-এই তিনটি চরিত্র অবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাহিনি রূপায়িত হয়েছে। প্রধান চরিত্র রাধা- এ চরিত্রকে কেন্দ্র করেই কাব্যের আখ্যানবস্তুর বিকাশ ঘটেছে। রাধা চরিত্রের বিকাশে ও পরিণতিতে বড়ু চণ্ডীদাস যে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তা বিস্ময়কর। কৃষ্ণ চরিত্র অঙ্কনে কবি পৌরাণিক ও মৌলিক ভাবের সম্মিলন ঘটিয়েছেন। কৃষ্ণ চরিত্রে স্থূল দাম্ভিকতা, দেহললুপ রিরংসা ও প্রতিশোধ গ্রহণের কুটিল ইচ্ছা ছাড়া অন্য কোনো মহৎ গুণ বা কোমল মানবিক প্রবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। এ চরিত্রে পূর্ণতা বা সঙ্গতি নেই। কামপ্রবৃত্তির প্রবণতা, বালসুলভতা, লঘুকৌতুক ও গ্রাম্যতা কৃষ্ণ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। বড়াই চরিত্রটি রসিকতায়, কূটবুদ্ধিতে, ছদ্ম-অভিনয়ে সার্থকতার পরিচায়ক। টাইপ জাতীয় চরিত্র হিসেবে এর মর্যাদা স্বীকার্য। বড়াই গ্রাম্য কুটনী জাতীয় চরিত্র।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের বিষয়বস্তু

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য মোট তের খণ্ডে বিভক্ত। খণ্ডগুলো হলো: ১. জন্মখণ্ড, ২. তাম্বুলখণ্ড, ৩. দানখণ্ড, ৪. নৌকাখণ্ড, ৫. ভারখণ্ড, ৬. ছত্রখণ্ড, ৭. বৃন্দাবনখণ্ড, ৮. কালিয়দমনখণ্ড ৯. যমুনাখণ্ড, ১০. হারখণ্ড ১১. বাণখণ্ড, ১২. বংশীখণ্ড, ১৩. রাধাবিরহ। জন্মখণ্ডে রাধাকৃষ্ণের জন্মকাহিনি বর্ণিত হয়েছে। তাম্বুলখণ্ডে রাধার অসামান্য রূপলাবণ্যের কথা শুনে কৃষ্ণ বড়াইয়ের মাধ্যমে আয়ান ঘোষের পত্নী রাধাকে তাম্বুলাদি প্রেরণ করে, কিন্তু স্বরূপবিস্মৃতা রাধাকর্তৃক তা প্রত্যাখ্যান করা হয়। দানখণ্ডে কৃষ্ণ বড়াইয়ের সহায়তায় রাধার দধিদুগ্ধের পসার নষ্ট করে রাধাকে বলপূর্বক সম্ভোগ করে। নৌকাখণ্ডে কৃষ্ণ যমুনার কাণ্ডারী সেজে গোপীগণকে পার করে নৌকা ডুবিয়ে রাধার সঙ্গে জলবিহারে মগ্ন হয়। এখান থেকেই রাধার মনের প্রতিকূলতা দূর হতে থাকে। ভারখণ্ডে কৃষ্ণ ভারবাহীরূপে রাধার পসরা বহন করে। ছত্রখণ্ডে রাধাকে সূর্যতাপ থেকে রক্ষা করার জন্য কৃষ্ণের ছত্রধারণ এবং রাধাকর্তৃক রতিদানের আশ্বাস প্রদান করা হয়। বৃন্দাবনখণ্ডে গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের বনবিহার এবং রাধাকৃষ্ণের মিলন। যমুনাখণ্ডে কৃষ্ণের কালীয় নাগের দমন, গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের জলবিহার এবং এবং কৃষ্ণকর্তৃক গোপীদের বস্ত্রহরণ কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। হারখণ্ডে রাধার হার অপহরণের জন্য যশোদার কাছে কৃষ্ণের বিরুদ্ধে রাধার অভিযোগ। বাণখণ্ডে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কৃষ্ণ রাধার প্রতি মদনবাণ নিক্ষেপ করে, এতে রাধা মূর্ছা যায়। ফলে কৃষ্ণের মনে অনুতাপ জাগে, বড়াই কৃষ্ণকে বন্ধন করে, পরে কৃষ্ণের অনুনয়ে বন্ধনমোচন করা হয়। কৃষ্ণ রাধার চৈতন্য সম্পাদন করে এবং উভয়ের মিলন ঘটে। বংশীখণ্ডে কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনে রাধার মনে প্রবল উৎকণ্ঠা জাগে, রাধা কৃষ্ণের বংশী অপহরণ করে এবং পরে কৃষ্ণের অনুনয়ে তা ফেরত দেয়। রাধাবিরহে রাধার বিরহ, উভয়ের মিলন, রাধার নিদ্রা এবং সেই অবকাশে কৃষ্ণের কংসবধের জন্য মথুরা যাত্রা।

চণ্ডীদাস সমস্যা

'চণ্ডীদাস সমস্যা' বাংলা সাহিত্যে একটি বিতর্কিত সমস্যা। চণ্ডীদাসের পদাবলি দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত থাকলেও একাধিক চণ্ডীদাস সম্পর্কিত চণ্ডীদাস সমস্যার উদ্ভব হয়েছে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে (১৩২৩ বঙ্গাব্দে) বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রকাশের পর থেকে। ১৮৯৬ সালে প্রকাশিত ড. দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে একজন চণ্ডীদাসের কথা বলা হয়েছিল।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য প্রকাশিত হওয়ায় একাধিক চণ্ডীদাস সম্পর্কে ধারণা দৃঢ় হলো। ১৩৪১ সনে মণীন্দ্রমোহন বসু কর্তৃক দীন চণ্ডীদাসের পদাবলি প্রকাশিত হলে চণ্ডীদাস সমস্যা আরও জটিল হয়ে পড়ে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রকাশের পর দেখা গেল এ কাব্যের ভাষা, রুচি ও রসের ধারার সঙ্গে পদাবলির চণ্ডীদাসের বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান । বাসলী-সেবক বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচয়িতা এবং তিনি চৈতন্যপূর্ববর্তী কবি। পদাবলির চণ্ডীদাসের সঙ্গে তাঁর কোনো সামঞ্জস্যই নেই। তাই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বড়ু চণ্ডীদাস ও পদাবলির দ্বিজ চণ্ডীদাস ভিন্ন কবি বলে ধারণা জন্মে। পরে মণীন্দ্রমোহন বসু দেখালেন যে, পদাবরির চণ্ডীদাস বড়ু বা দ্বীজ চণ্ডীদাস নন, তিনি দীন চণ্ডীদাস।

↘ শ্রীচৈতন্যদেব কোনো একজন চণ্ডীদাসের পদ আস্বাদন করতেন। এ সম্পর্কে চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে বলা হয়েছে;

১. বিদ্যাপতি জয়দেব চণ্ডীদাসের গীত।
আস্বাদয়ে রামানন্দ স্বরূপ সহীত ॥

২. বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিন গীতি করয়ে প্রভুর আনন্দ ॥

ড. সুকুমার সেন ও মণীন্দ্রমোহন বসু দুজন চণ্ডীদাসের কথা বলেছেন। অন্যদিকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও সতীশচন্দ্র রায়ের মতে চণ্ডীদাস তিনজন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে, চণ্ডীদাস তিনজন: বড়ু চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস ও দ্বিজ চণ্ডীদাস। বিভিন্ন সময়ে পণ্ডিতগণের আবিষ্কৃত তথ্যাদি থেকে যে কজন চণ্ডীদাসের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে তাঁদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি বড়ু চণ্ডীদাস সবচেয়ে প্রাচীন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে যে প্রাচীনত্বের লক্ষণ লক্ষ করেছেন, তা মধ্যযুগের অন্য কোনো কাব্যে নেই।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ১৩৭০ খ্রিস্টাব্দে বড়ু চণ্ডীদাসের জন্ম এবং ১৪৩৩ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু অনুমান করেছেন। এই বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্বে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য রচনা করেছিলেন। চৈতন্যদেব যে চণ্ডীদাসের কাব্য আস্বাদন করেছেন বলে উল্লেখিত হয়েছে তিনি বড়ু চণ্ডীদাস নন।

চণ্ডীদাস সমস্যা সমাধানে দ্বিজ চণ্ডীদাস নামে অন্য একজন চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে। ভাব ও ভাষা বিচারে দ্বিজ চণ্ডীদাস স্বতন্ত্র কবি। ড. সুকুমার সেনের মতে, এই চণ্ডীদাসের জীবৎকাল ১৫২৫ খ্রিস্টাব্দের এ দিকে হইবে না।' দ্বিজ চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক বিচ্ছিন্ন পদাবলি রচনা করেছিলেন।

এরপর দীন চণ্ডীদাসের কথা উল্লেখযোগ্য। মণীন্দ্রমোহন বসু মনে করেন, দীন চণ্ডীদাসের পদগুলো দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতায় চলেছে। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা এখন পৃথক কবি। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মনে করেন দীন চণ্ডীদাসের প্রামাণিক ভণিতায় বাসলী দেবীর কোনো উল্লেখ নেই, রজকিনী রামী বা নান্নুরেরও উল্লখ নেই।

মণীন্দ্রমোহন বসুর মতে ১৭০০ থেকে ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে দীন চণ্ডীদাসের পদাবলি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ দীন চণ্ডীদাসকে সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধের লোক মনে করেছেন। চণ্ডীদাস সমস্যার এই জটিলতার প্রেক্ষিতে কেউ কেউ সহজিয়া চণ্ডীদাস নামে চতুর্থ চণ্ডীদাসের পরিকল্পনা করেন।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতানুযায়ী চৈতন্যপূর্বযুগের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস এবং চৈতন্যপরবর্তী পদাবলির দীন চণ্ডীদাস-এই তিনজনকে স্বীকার করতে হয়।

চণ্ডীদাস সমস্যা সম্পর্কে পণ্ডিতেরা মতানৈক্য দূর করতে সক্ষম হননি। দৃঢ় নিশ্চয়তাসহ সমাধান দেয়ার মতো উপাদানের এখনও অভাব। মধ্যযুগের বিস্তৃত পরিসরে প্রায় চার শ বছর ধরে চণ্ডীদাস নামধারী কবিগণ কবিতা রচনা করেছেন। পাঠক-হৃদয় জয় করার বিস্ময়কর ক্ষমতার গুণে যুগ যুগ ধরে তাঁদের পদ সমাদৃত হয়েছে। কবিতার রসের দিকে পাঠকের যত আকর্ষণ ছিল, কবির জীবন-তথ্যের প্রতি তাদের তত মনোযোগ ছিল বলে মনে হয় না। তাঁদের সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহে জটিলতা বিদ্যমান বলে চণ্ডীদাস সমস্যা বাংলা সাহিত্যে একটি রহস্যজনক অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে।

বাংলা সাহিত্য : মধ্যযুগ | মধ্যযুগের সাহিত্য : মঙ্গলকাব্য

বিগত BCS প্রশ্নাবলী

০১) ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের কবি প্রতিভার মূল্যায়ন করুন। (৩৬তম BCS)
০২) তিনটি মঙ্গলকাব্যের নাম লিখুন। (৩৩তম BCS)
০৩) 'মনসামঙ্গল' কাব্যের যে কোনো একজন কবির পরিচয় লিখুন। (৩৩তম BCS)

০৪) মঙ্গলকাব্যের বৈশিষ্ট্য লিখুন। (৩০তম BCS)
০৫) মনসামঙ্গল কাব্য উদ্ভবের সামাজিক কাব্য প্রেক্ষাপট বর্ণনা করুন। (২৮তম BCS)
০৬) বাংলা মঙ্গলকাব্য ধারার দুজন বিখ্যাত কবির নাম লিখুন, প্রত্যেকের একটি করে কাব্যের নামসহ। (২৭তম BCS)
০৭) ভারতচন্দ্রের কাব্যের নাম কী? কাব্যে আরবি, ফারসি শব্দ ব্যবহার প্রসঙ্গে তিনি কী বলেছেন। (২০তম BCS)
০৮) 'মঙ্গলকাব্য'-এমন নাম দেয়ার কারণ কী? (১৮তম BCS)
০৯) চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের রচয়িতা কে? কোন শতাব্দীর রচনা? (১৭তম BCS)
১০) বিজয় গুপ্তের দেশ কোথায়? তিনি কোন উপাখ্যান নিয়ে কোন সময়ে কাব্য লেখেন? (১৫তম BCS)
১১) ভারতচন্দ্র কোন রাজসভার কবি ছিলেন? (১৩তম BCS)
১২) 'অন্নদামঙ্গল' কার রচনা? (১১তম BCS)

আলোচ্য বিষয়

মধ্যযুগের সাহিত্য : মঙ্গলকাব্যের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

০১) মঙ্গলকাব্য কাকে বলে? মঙ্গলকাব্য কত প্রকার ও কী কী?
০২) মঙ্গলকাব্যের কয়টি অংশ থাকে? আলোচনা করুন।
০৩) মঙ্গলকাব্যের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।
০৪) মঙ্গলকাব্যের নামকরণের পিছনে দুইটি কারণ উল্লেখ করুন।
০৫) মঙ্গলকাব্যের প্রধান প্রধান অংশের নাম লিখুন।
০৬) 'মনসামঙ্গল' কাব্যের কবিদের পরিচয় দিন।
০৭) চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি কে? তার শ্রেষ্ঠত্বের কারণ নির্দেশ করুন।
০৮) ভারতচন্দ্র রায়ের পরিচয় দিন।

STUDENT STUDY মধ্যযুগের সাহিত্য: মঙ্গলকাব্য

মঙ্গলকাব্যের নামকরণ

মঙ্গল শব্দটির আভিধানিক অর্থ 'কল্যাণ'। যে কাব্যে দেবতার আরাধনা ও মাহাত্ম্য-কীর্তন করা হয়, যে কাব্যের কাহিনি শ্রবণ করলে সর্ববিধ অকল্যাণনাশ হয় এবং পূর্ণাঙ্গ মঙ্গল লাভ ঘটে তাকে মঙ্গলকাব্য বলে। মূলত দেবদেবীর গুণগান মঙ্গল কাব্যের উপজীব্য। মধ্যযুগের উল্লেখযোগ্য মঙ্গলকাব্যসমূহ হলো-মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ইত্যাদি।

মঙ্গলকাব্যের শাখাসমূহ

মঙ্গলকাব্যের প্রধান শাখা দুটি। যথা: ১. পৌরাণিক মঙ্গলকাব্য ও ২. লৌকিক মঙ্গলকাব্য।
পৌরাণিক শাখার মধ্যে রয়েছে- গৌরীমঙ্গল, ভবানীমঙ্গল, দুর্গামঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, কমলামঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, চণ্ডিকামঙ্গল ইত্যাদি।
লৌকিক মঙ্গলকাব্যগুলো হলো শিবমঙ্গল, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, কালিকামঙ্গল, শীতলামঙ্গল, রায়মঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, সারদামঙ্গল, সূর্যমঙ্গল প্রভৃতি।

মঙ্গলকাব্যের বৈশিষ্ট্য সাহিত্যমূল্য

০১) মঙ্গলকাব্যে লোকভাষা ও গ্রাম্যচেতনার প্রধান্য রয়েছে।
০২) এ কাব্যসমূহের ভাষা অলংকারবর্জিত।
০৩) মঙ্গলকাব্যে অক্ষর মাত্রিক পয়ার ছন্দে গদ্যের চাল বেশি।
০৪) মঙ্গলকাব্যে বাস্তব জীবনের তুচ্ছ সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে বলে কাব্যগুলো উপন্যাসধর্মী।
০৫) এ সব কাব্যে বাংলাদেশের আর্যেতর গ্রামীণ ও লৌকিক দেবসংস্কার এবং জীবনবাদ নিহিত আছে।

০৬) মঙ্গলকাব্যে সাম্প্রদায়িক দেবকাহিনি সর্বজনীন মানবিক সংবেদনাপূর্ণ সাহিত্যরূপে নবজন্ম লাভ করেছিল।
০৭) মঙ্গলকাব্যগুলো দেবদেবীর কাহিনি অবলম্বনে রচিত হলেও এতে বাঙালি জীবনের ইতিহাস প্রতিফলিত হয়েছে।

মঙ্গলকাব্যের বিষয়বস্তু

মঙ্গলকাব্য প্রধানত কাহিনি কেন্দ্রিক। মূল কাহিনির সঙ্গে দেবলীলা, ধর্মতত্ত্ব ও নানা ধরনের বর্ণনায় এসব কাব্য বিপুলায়তন লাভ করেছে। মঙ্গলকাব্যে লৌকিক গ্রামীণ সংস্কার, আর্যেতর দেববিশ্বাস এবং পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও চিন্তাধারা ক্রমে ক্রমে সমন্বয় লাভ করে। এ কাব্যসমূহের বিষয়বস্তু হলো-প্রথমেই পঞ্চদেবতার বন্দনা, তারপর গ্রন্থ উৎপত্তির কারণ বর্ণনা, সৃষ্টির রহস্য বর্ণনা, মনুর প্রজাসৃষ্টি, প্রজাপতির শিবহীন যজ্ঞ, সতীর দেহত্যাগ, উমার তপস্যা, মদনভস্ম, রতিবিলাপ, গৌরীর বিয়ে, কৈলাসে হরগৌরীর কোন্দল, শিবের ভিক্ষাযাত্রা, পার্বতী-চণ্ডী বা শিবের সম্পর্কিত অন্য কেউ যেমন মনসা প্রভৃতির নিজেদের পূজাপ্রচারের চেষ্টা, বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে পূজাপ্রচার, স্বর্গভ্রষ্ট দেবশিশুর স্বর্গে প্রত্যাবর্তন প্রভৃতির বৈচিত্র্যহীন বর্ণনা। তাছাড়া বারমাসী, নারীগণের পতিনিন্দা, চৌতিশা বা বর্ণানুক্রমিক চৌত্রিশ অক্ষরে দেবতার স্তব প্রভৃতিও মঙ্গলকাব্যের অঙ্গ হয়ে আছে।

মনসামঙ্গল

বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে মনসামঙ্গল প্রাচীনতম। এটি কেবল দেবী মনসার মঙ্গল গাথাই নয়,বিদ্রোহী মানবতার যশোগানও। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের চেয়ে মনসামঙ্গল কাব্যে আধুনিক মনোভাবের পরিচয় সার্থকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। মঙ্গলকাব্যের ধারায় মনসাঙ্গল বিশিষ্টতা অর্জন করেছে নিয়তির বিরুদ্ধে মানুষের বিদ্রোহের কাহিনির জন্য। একে পদ্মাপুরাণ নামেও অভিহিত করা হয়।

মনসামঙ্গলের বিষয়বস্তু

মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনি বাংলার আদিম লোকসমাজে প্রচলিত সর্পপূজার ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। সাপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসা-লৌকিক ভয়ভীতি থেকেই এ দেবীর উদ্ভব। তাঁর অপর নাম কেতকা ও পদ্মাবতী। এই দেবীর কাহিনি নিয়ে রচিত কাব্য মনসামঙ্গল।

মনসামঙ্গলের কবিগণ

১) কানা হরিদত্ত (মঙ্গলকাব্যের আদিকবি), ২) নারায়ণ দেব (পদ্মপুরাণ রচয়িতা), ৩) বিজয়গুপ্ত, ৪) বিপ্রদাস পিপিলাই (মনসাবিজয় কাব্যের রচয়িতা), ৫) দ্বিজ বংশীদাস (রামায়ণের মহিলা অনুবাদক চন্দ্রাবতীর পিতা), ৬) কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, ৭) ক্ষেমানন্দ।

চণ্ডীমঙ্গল

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মঙ্গল কাব্যের ধারায় চণ্ডীমঙ্গল একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে সাধারণ, বর্ণহীন ও তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনায় সম্প্রসারিত মানব জীবন বর্ণিত হয়েছে। এ ধরনের দুটি কাহিনি কেবল চণ্ডীমঙ্গলেই পাওয়া যায়, অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে একটি মাত্র কাহিনি রয়েছে। তবে অপরাপর মঙ্গল কাব্যের মতোই চণ্ডীমঙ্গলেও দেবখণ্ড আছে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনিতে ব্যাধের ওপর চণ্ডীর প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে সমাজের নিচু পর্যায়ের মানুষের মধ্যে পূজা প্রচারের কথা বলা হয়েছে; আবার বণিকের ওপর প্রভাব বিস্তার করে অভিজাত শ্রেণির মানুষের মধ্যে চণ্ডীর পূজা প্রচারের কথাও বর্ণিত হয়েছে।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনি

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনি দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম-আক্ষেটিক খণ্ড এবং দ্বিতীয়-বণিকখণ্ড। প্রথম খণ্ডে আক্ষেটিক বা ব্যাধ কালকেতুর কাহিনি এবং দ্বিতীয় খণ্ডে বণিক ধনপতির কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এ ধরনের দুটি কাহিনি কেবল চণ্ডীমঙ্গলেই পাওয়া যায়, অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে একটি মাত্র কাহিনি রয়েছে। তবে অপরাপর মঙ্গল কাব্যের মতই চণ্ডীমঙ্গলেও দেবখণ্ড আছে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনিতে ব্যাধের ওপর চণ্ডীর প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে সমাজের নিচু পর্যায়ের মানুষের মধ্যে পূজা প্রচারের কথা বলা হয়েছে; আবার বণিকের ওপর প্রভাব বিস্তার করে অভিজাত শ্রেণির মানুষের মধ্যে চণ্ডীর পূজা প্রচারের কথাও বর্ণিত হয়েছে।

চণ্ডীমঙ্গলের কবি

১) মাণিক দত্ত (চণ্ডীমঙ্গলের আদিকবি), ২) দ্বিজ মাধব ('সারদামঙ্গল' রচয়িতা), (৩) মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (চণ্ডীমঙ্গলের শ্রেষ্ঠকবি), ৪) দ্বিজ রামদেব ('অভয়ামঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা), ৫) মুক্তরামা সেন ('সারদামঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা), ৬) হরিরাম ৭) লালা জয়নারায়ণ সেন।

অন্নদামঙ্গল

কাব্যটি কেবল অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থই নয়, বরং বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলোর অন্যতম। কবির পরিণত বয়সের এ রচনায় পরিপক্ব রচনাশক্তির পরিচয় রয়েছে। অন্নদামঙ্গল বা অন্নপূর্ণামঙ্গল বাক্যের আটটি পালা। কাব্যটি তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ড-শিবায়ন অন্নদামঙ্গল, দ্বিতীয় খণ্ড-বিদ্যাসুন্দর কালিকামঙ্গল এবং তৃতীয় খণ্ড-মানসিংহ অন্নদামঙ্গল।

প্রকৃতপক্ষে, তিন খণ্ডকে তিনটি স্বতন্ত্র কাব্য হিসেবে বিবেচনা করা যায়। প্রথম খণ্ড মুকুন্দারামের চণ্ডীমঙ্গলের অনুকরণে রচিত। এই অংশেই প্রকৃত অন্নদামঙ্গল বা অন্নপূর্ণামঙ্গল। চণ্ডী ও অন্নদা অভিন্ন-একই দেবীর দুই নাম। এ দেবীর কাহিনিই চণ্ডীমঙ্গলে ও অন্নদামঙ্গলে স্থান পেয়েছে বলে দুই কাব্যের পৌরাণিক অংশে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। তবে লৌকিক অংশে পার্থক্য বিদ্যমান। ভারতচন্দ্রের ওপর সংস্কৃত পুরাণের প্রভাবের ফলে মুকুন্দরামের চণ্ডী অন্নদামঙ্গলে অন্নদায় পরিণত হয়েছেন। অন্নদামঙ্গল কাব্যে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ড বিদ্যাসুন্দর নামে পরিচিত। এ অংশে কালিকামঙ্গলের ধারা অনুসৃত হয়েছে বলে একে কালিকামঙ্গল বলা যায়। কবি এতে নিছক মর্ত্যজীবনের প্রেমচিত্র অঙ্কন করে কালিকাদেবীর কিঞ্চিৎ চরণামৃত ছিটিয়ে দিয়েছেন। বিদ্যাসুন্দরের কাহিনিটি আগেই এ দেশে প্রচলিত ছিল।

তৃতীয় খণ্ডে মানসিংহের বাংলা আক্রমণ,ভবানন্দ মজুমদারের সাহায্য লাভ এবং প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে যুদ্ধের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। দেবী অন্নপূর্ণার ভূমিকা এ অংশে উল্লেখযোগ্য বলে মানসিংহ উপাখ্যান অন্নপূর্ণামঙ্গল নামেও পরিচিত।

অন্যদামঙ্গল কাব্যের তিন খণ্ডের বিষয়বস্তুর মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ক্ষীণ। কাব্যের যোগসূত্র দেবী অন্নদার কৃপায় ভবানন্দ মজুমদারের ভাগ্যোদয় কাব্যের প্রধান কাহিনি। অন্নদামঙ্গল কাব্যের প্রথম অংশে দেবী খণ্ড এবং শেষ অংশে মানসিংহ খণ্ড কাহিনির দিক থেকে অনুকরণকারী হিসেবে রেহাই দিয়ে মৌলিকতার মর্যাদা দিয়েছে। কবির অনন্য প্রতিভার দলিল হিসেবেও একে মনে করা হয়েছে।

ভারতচন্দ্র রায়

কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র অষ্টাদশ শতকের শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবেও মর্যাদার অদিকারী। মঙ্গলকাব্য ধারার শেষ কবি ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দর কাহিনিও শ্রেষ্ঠ কবি রূপে পরিগণিত। কবি ভারতচন্দ্রের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 'অন্নদামঙ্গল কাব্য'। 'কালিকামঙ্গল' ও 'বিদ্যাসুন্দর' এই কাব্যের অংশমাত্র।

ভারতচন্দ্রের জন্মকাল নিয়ে মতানৈক্য আছে। বিভিন্ন তথ্য ও অনুমান মিলিয়ে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, ভারতচন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ১৭০৫ থেকে ১৭১০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

চল্লিশ বৎসর বয়সে ভারতচন্দ্র নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাকবি নিযুক্ত হন। তাঁর মাসিক বেতন ছিল চল্লিশ টাকা। কবি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে প্রতিদিন কবিতা রচনা করে শোনাতেন। তাঁর কবিত্বে মুগ্ধ হয়ে রাজা তাঁকে 'গুণাকর' উপাধি প্রদান করেন এবং প্রচুর ভূসম্পত্তি উপহার দেন। ভারতচন্দ্র পলাশী যুদ্ধের তিন বৎসর পর ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে মারা যান।

ভারতচন্দ্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। কবি গ্রন্থ উৎপত্তি সম্পর্কে বলেছেন যে, একদিকে দেবীর আদেশ, অন্যদিকে রাজার আদেশে কাব্য রচনা করেছেন। তিনি বাংলা সংস্কৃত ফারসি হিন্দি মিশ্রিত ভাষায়ও কিছু কিছু কবিতা রচনা করেছিলেন। এসব নিদর্শন থেকে তাঁর প্রতিভার বৈচিত্র্য উপলব্ধি করা যায়। অন্নদামঙ্গল কাব্যের ঔজ্জ্বল্যে ভারতচন্দ্রের অপরাপর কবিকৃতি ম্লান হয়ে গেছে। ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দে অন্নদামঙ্গল রচিত হয়।

ভারতচন্দ্র রায়ের শ্রেষ্ঠত্ব

অন্নদামঙ্গল কাব্যে প্রধান চরিত্রচিত্রণে কবি নিপুণতার পরিচয় দিতে না পারলেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়, ঘটনা বা চরিত্রের সার্থক রূপায়ন সম্ভব হয়েছে। ঈশ্বরী পাটনী, হীরা মালিনী প্রভৃতি চরিত্র যেন একান্ত বাস্তব হয়ে ফুটে উঠেছে। ঈশ্বরী পাটনী বাংলা সাহিত্যের অমর চরিত্র। দেবীর পায়ের স্পর্শে লোহার সেঁউতি যখন সোনার সেঁউতিতে পরিণত হলো তখন সেই নারীর দেবীত্বে ঈশ্বরী পাটনীর মনে নিশ্চয়ই কোনো সন্দেহ ছিল না, সে বলেছিল, 'এত মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয়।' অথচ তার প্রার্থনায় ছিল না স্বর্গ সুখের কামনা কিংবা দেবীর চরণপ্রসাদ; সে প্রার্থনা করল-'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।'

বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনামতেও কবির কৃতিত্ব কম নয়। যুদ্ধ, ঝড়বৃষ্টি, রন্ধন, বিদ্যার রূপ প্রভৃতি বর্ণনায় কৃতিত্বের নিদর্শন বর্তমান। কৌতুক ও হাস্যরস সৃষ্টিতে কবি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর কাব্যে স্থূল কুরুচিও অনন্যসাধারণ শিল্পকৃতি লাভ করেছে। তাঁর হাতে প্রাচীন উপমা নবরূপে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্যে প্রায় সকল রকমের অলঙ্কারের প্রয়োগ করেছেন। ভাষা ও ছন্দের সংহত ও সমন্বিত অবয়বে ভারতচন্দ্রের কাব্যদেহ নিঁখুত লাবণ্যে হয়ে উঠেছে অপরূপ। মধ্যযুগের 'অতুল্য অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও সর্বশেষ কবি' ভারতচন্দ্রের মধ্যে জ্ঞান-প্রজ্ঞা-অভিজ্ঞতা সুসংহত ও সমন্বিত হয়েছিল। তাঁর কাব্যের অলঙ্কারের অবয়বে অসংখ্য বাকপ্রতিমা মণিমুক্তার মতো বিচ্ছুরিত হয়। তাই ড. আহমদ শরীফ মন্তব্য করেছেন, 'ভাষা ছিল তার হাতে কুমোরের কাদার মতো। কাব্যদেহ নির্মাণে তাঁর ভাষা, ছন্দবোধ ও শিল্পরুচি ছিল অতুল্য আর বিন্যাসে নৈপুণ্যও ছিল কুমোরের নিপুণ হাতের ও নিখুঁত চাকের মতোই। ছন্দে ভারতচন্দ্র অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। তিনি বিভিন্ন ছন্দের প্রবর্তনের মাধ্যমে বাংলা কাব্যে বিচিত্র গতিশীলতা আনয়ন করেছিলেন। ভারতচন্দ্র ছিলের শব্দকুশলী কবি। সুললিত ও রসাল শব্দ ব্যবহারে তিনি যেমন কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তেমন রুদ্র ও বীভৎস রস বর্ণনার উপযোগী শব্দাবলির প্রয়োগও সম্ভব হয়েছে। সংস্কৃত, ফারসি, হিন্দি ভাষার তাঁর বিশেষ ক্ষমতা ছিল বলে তিনি পছন্দমত শব্দ চয়নে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কবির বাগ্‌বিদগ্ধতায় সমৃদ্ধ অনেক বক্তব্য সুপ্রচলিত প্রবচন বা সুভাষিত উক্তির মর্যাদা লাভ করেছে। যেমন:

১. মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।
২. নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।
৩. যতন নহিলে নাহি মিলয়ে রতন।
৪. নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে।
৫. বাপে না জিজ্ঞাসে মায়ে না সম্ভাষে যদি দেখে লক্ষ্মীছাড়া।
৬. হাভাতে যদ্যপি চায় সাগার শুকায়ে রায়।
৭. বাঘের বিক্রম সম মাঘের শিশির ।
৮. কড়িতে বাঘের দুধ মিলে।
৯. বড়র পিরীতি বালির বাঁধ।
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ॥
১০. যার কর্ম তারে সাজে অন্য লোকের লাঠি বাজে।
১১. ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।
১২. মিছা কথা সিচা জল কতক্ষণ রয়।
১৩. জন্মভূমি জননী স্বর্গের গরিয়সী।

এসব গভীরতম ভাবদ্যোতক প্রবচনের মতো পদে ভাষার ওপর কবির যে অধিকার প্রমাণ করে তা তুলনারহিত।
ভারতচন্দ্রের তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল কৌতুকরস, মার্জিত ভাষা মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। তাই 'ভারত ভারতখ্যাত আপনার গুণে' ভারতচন্দ্রের কাব্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন, 'রাজসভাকবি রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল গান, রাজকণ্ঠের মণিমালার মতো, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা তেমন তাহার কারুকার্য।'

ধর্মমঙ্গল

ধর্মঠাকুর নামে এক পুরুষ দেবতার পূজা হিন্দু সমাজের ডোম সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এই ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য রচিত কাব্য ধর্মমঙ্গল কাব্য।

ধর্মমঙ্গলের বিষয়বস্তু

↘ ধর্মমঙ্গল কাব্যের দুটি কাহিনি:

ক) **রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনি:** রাজা হরিশ্চন্দ্র ও তাঁর রানি মদনা নিঃসন্তান ছিলেন বলে লজ্জায় লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারছিলেন না। মনের দুঃখে তাঁরা ঘুরতে ঘুরতে বল্লুকা নদীর তীরে এসে দেখলেন সেখানে ভক্তেরা ধর্মের পূজা করছে। রাজারানিও ধর্মের পূজা করে তাঁর কাছে পুত্রবর প্রার্থনা করলেন। ধর্ম তাঁদের পুত্রলাভের বর দিলেন। পুত্রটিকে যথা সময়ে ধর্মের কাছে বলি দিতে হবে। রাজা পুত্রের মুখ দেখার আশায় তাতেই রাজি হলেন। পুত্র জন্মালে তার নাম রাখা হলো লুইচন্দ্র বা লুইধর। এক সময় রাজারানি প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে গেলেন। একদিন ব্রাহ্মণের বেশে ধর্মঠাকুর উপস্থিত হয়ে রাজপুত্রের মাংস ভক্ষণের আকাঙ্ক্ষা জানালেন। রাজারানি প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করে পুত্রের দেহ কেটে রান্না করলেন। এতে ধর্মঠাকুর সন্তুষ্ট হয়ে নিজ মূর্তি ধারণ করে রাজপুত্রকে ফিরিয়ে দিলেন। রাজা মহাসমারোহে ধর্মের পূজা করলেন।

খ) **লাউসেনের কাহিনি:** গৌড়েশ্বরের একজন সামন্ত; নাম কর্ণসেন। ইছাই ঘোষ নামে জনৈক সামন্তের আক্রমণে কর্ণসেনের ছয় পুত্র মারা যায়। বৃদ্ধ বয়সে সকল পুত্রের মৃত্যুতে তিনি ভেঙে পড়েন। গৌড়েশ্বর কর্ণসেনকে সংসারে আবদ্ধ রাখার জন্য নিজের শ্যালিকা রঞ্জাবতীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে দেন। গৌড়েশ্বরের শ্যালক মহামদ তা পছন্দ করে নি। সে বৃদ্ধের ভগ্নিপতি কর্ণসেনকে আঁটকুড়ে বলে উপহাস করে। রঞ্জাবতী এ গ্লানি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ধর্মঠাকুরের কাছে পুত্রবর চেয়ে কঠোর ব্রত পালন করে। ধর্মের আশীর্বাদে এক পুত্র হলো। তার নাম লাউসেন। মহামদ এ সংবাদে রাগান্বিত হয়ে ভাগ্নেকে হত্যা করার চেষ্টা করে। কিন্তু ধর্মঠাকুরের দয়ায় সে প্রতিবারই বেঁচে যায়। যুবক লাউসেনের বীরত্বের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মহামদের কুপরামর্শে গৌড়েশ্বর তাকে নানা দুরূহ কাজে নিয়োজিত করেন। ধর্মের আশীর্বাদে সকল কাজেই সে সাফল্য অর্জন করতে থাকে। লাইসেন প্রতিবেশী রাজাদের পরাজিত

করে তাঁদের মেয়েকে বিয়ে করে। এক সময় লাউসেনের অনুপস্থিতির সুযোগে মহামদ তার রাজ্য আক্রমণ করে, কিন্তু সে লাউসেনের স্ত্রীর কাছে পরাজিত হয়। মহামদ গৌড়েশ্বরকে প্ররোচিত করাতে পশ্চিম দিকে সূর্যোদয় করানোর জন্য লাইসেন গৌড়েশ্বর কর্তৃক নির্দেশিত হলো। ধর্মের দয়ায় লাউসেন তাতেও সাফল্য অর্জন করল। ফলে চারদিকে তার গৌরবের কথা ছড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে দুষ্কর্মের শাস্তিস্বরূপ মহামদের কুষ্ঠ ব্যাধি হয়। লাউসেনের অনুরোধে ধর্মঠাকুর তাকে কুষ্ঠ থেকে আরোগ্য করে দিল। এভাবে ধর্মঠাকুরের মহিমা প্রচারিত হয়। লাউসেনও সুখে রাজত্ব করে যথাসময়ে স্বর্গে চলে গেল।

ধর্মমঙ্গলের কবিগণ

১) ময়ূরভট্ট (ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদিকবি), ২) আদি রূপরাম, ৩) খেলারাম চক্রবর্তী ('গৌড়কাব্য' পুঁথি রচয়িতা), ৪) মাণিকরাম, ৫) রূপরাম চক্রবর্তী, ৬) শ্যাম পণ্ডিত, ৭) সীতারাম দাস, ৮) রাজারাম দাস, ৯) ঘনরাম চক্রবর্তী, ১০) নরুসিংহ বসু।

অন্যান্য মঙ্গলকাব্য

ক) শিবমঙ্গল : ধ্বংসকর্তা ও লৌকিক দেবতা শিবকে নিয়ে রচিত।

খ) কালিকামঙ্গল : শক্তিদেবী চণ্ডী/কালীকে নিয়ে রচিত।

গ) শীতলামঙ্গল : বসন্তরোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শীতলাকে নিয়ে রচিত।

ঘ) ষষ্ঠীমঙ্গল : শিশু রক্ষয়িত্রী লৌকিক দেবী ষষ্ঠীকে নিয়ে রচিত।

ঙ) সারদামঙ্গল : বিদ্যা ও চারুকলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সারদা বা স্বরস্বতীর কাহিনি অবলম্বনে রচিত।

চ) রায়মঙ্গল : বাঘের দেবতা দক্ষিণরায়ের মাহাত্ম্যসূচক কাব্য।

ছ) সূর্যমঙ্গল : লৌকিক সূর্যদেবতার কাহিনি অবলম্বনে সূর্যমঙ্গল রচিত।

জ) গঙ্গামঙ্গল : গঙ্গার মাহাত্ম্য এবং ভগীরথ কর্তৃক মর্ত্যে গঙ্গা আনয়নের কাহিনি নিয়ে গঙ্গামঙ্গল রচিত।

ঝ) গৌরীমঙ্গল : আঠার শতকের শেষ ভাগের কবি নিবারণ সেন মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডীর কাহিনি অবলম্বনে গৌরীমঙ্গল কাব্য রচিত।

বিগত BCS প্রশ্নাবলী

০১) ব্রজবুলি কী? (৩৬তম BCS)
০২) বৈষ্ণব পদাবলি ধারায় বিদ্যাপতির বিশেষত্ব ব্যাখ্যা করুন। (৩৫তম BCS)
০৩) বৈষ্ণব পদাবলির তিনজন পদকর্তার নাম লিখুন। (৩৩, ২৫ ও ২১তম BCS)
০৪) বিখ্যাত চারজন বৈষ্ণব পদকর্তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেন। (৩২তম BCS)
০৫) বৈষ্ণব পদাবলি কী? এগুলো কোন শতাব্দীর রচনা? (২৯তম BCS)
০৬) 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'- কোন কবির বাণী? (১৫তম BCS)

আলোচ্য বিষয়

মধ্যযুগের সাহিত্য: বৈষ্ণব পদাবলি : গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

০১) বৈষ্ণব পদাবলি কী? এগুলো কোন শতাব্দীর রচনা?
০২) বৈষ্ণব পদাবলির চারজন পদকর্তার নাম লিখুন।
০৩) 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল'- কোন কবির রচনা?
০৪) ব্রজবুলি কী?

STUDENT STUDY মধ্যযুগের সাহিত্য: বৈষ্ণব পদাবলি

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রধানতম গৌরব ও শ্রেষ্ঠতম ফসল বৈষ্ণব পদাবলি। মূলত বৈষ্ণব পদাবলি হলো বৌদ্ধ বা বৈষ্ণবীয় ধর্মের/তত্ত্বের রসভাস্য। ব্রজবুলি ভাষায় রচিত এ পদাবলির উপজীব্য হলো রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলায় জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলনাকাঙ্ক্ষা। বৈষ্ণব পদাবলির উল্লেখযোগ্য পদকর্তাগণ হলেন- ১) চণ্ডীদাস, ২) বিদ্যাপতি ৩) জ্ঞানদাস, ৪) গোবিন্দদাস।

বিদ্যাপতি

বিদ্যাপতি ছিলেন মিথিলার রাজসভার কবি। রাজা শিবসিংহ তাঁকে কবিকণ্ঠহার উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁর রচিত কয়েকটি গ্রন্থের নাম- পুরুষপরীক্ষা, কীর্তিলতা, কীর্তিপতাকা, গঙ্গাবাক্যাবলী, বিভাগসার। বাঙালি না হয়েও অথবা বাংলায় কবিতা রচনা না করেও তিনি বাঙালির শ্রদ্ধেয় কবি। তিনি ব্রজবুলি ভাষায় তাঁর পদ রচনা করেছেন। ব্রজবুলি ভাষা মূলত মৈথিলি ও বাংলার মিশ্রণে এক মধুর সাহিত্যিক কৃত্রিম ভাষা। রবীন্দ্রনাথের 'ভানুসিংহের পদাবলি' ব্রজবুলির ঢঙেই রচিত হয়েছে। বিদ্যাপতিকে 'অভিনব জয়দেব' ও 'মিথিলার কোকিল' বলেও আখ্যা দেয়া হয়। তাঁর পদাবলির কয়েকটি লাইন-

এ সখি, হামরি দুখের নাহি ওর ।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।।

চণ্ডীদাস

বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলির আদি রচয়িতা কবি চণ্ডীদাস। শিক্ষিত বাঙালি, বৈষ্ণব সাহিত্যের রস ও আনন্দের সংবাদ পেয়েছেন চণ্ডীদাসের পদাবলি থেকে। চৈতন্যদেব যাঁর পদাবলি শুনে মোহিত হতেন তিনি এই চণ্ডীদাস। তাঁর পদের বিখ্যাত লাইন -

সবার উপরে মানুষ সত্য,
তাহার উপরে নাই।

জ্ঞানদাস

সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দীতে বর্ধমান জেলায় কবি জ্ঞানদাসের জন্ম। তিনি চণ্ডীদাসের কাব্যাদর্শ অনুসরণ করেন এবং তাঁর সঙ্গে নিজের মৌলিক প্রতিভার সমন্বয়ে রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণনার মাধ্যমে মানব-মানবীর শাশ্বত প্রেম -বেদনার কথাই ব্যক্ত করেছেন। জ্ঞানদাসের একটি পদের দুটি লাইন-

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মনে ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।।

গোবিন্দদাস

বিদ্যাপতির ভাবাদর্শে তিনি বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। বিদ্যাপতির অলঙ্কার এবং চিত্রকল্পে তাঁকে মুগ্ধ করেছিলেন। গোবিন্দদাসও মহান কবি, তাঁর কল্পনা মোহকর। তিনি কল্পনাকে চমৎকার অলংকার পরিয়ে দেন। তার কয়েকটি পঙক্তি-

যাহাঁ যাহাঁ নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি।
তাহাঁ তাহাঁ বিজুরি চমকময় হোতি।।

বলরাম দাস

একাধিক বলরামদাসের কথা পণ্ডিতেরা অনুমান করে থাকেন। তাঁর নামে যে সব পদ পাওয়া যায় তাতে সবচেয়ে বেশি কবিত্বের পরিচয় দিয়েছেন বাৎসল্যরস ও রসোদ্গারের পদে। রাধার আক্ষেপানুরাগের পদগুলোও শ্রেষ্ঠ কীর্তি। তিনি প্রাণের গভীর আবেগে যে সুখদুঃখের চিত্র উদঘাটিত করেছেন তা তাঁকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। তাঁর পদের মূল সুর হচ্ছে সহজ জীবনরসপ্রীতি। বলরাম দাসের একটি পদে কৃষ্ণের রূপে আকৃষ্ট রাধার উক্তি এভাবে প্রকাশ পেয়েছে:

মুখ দেখিতে বুক বিদরে
কে তাহে পরাণ ধরে।
ভাবিলে কামিনী দিবস রজনী
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরে॥

লোচনদাস

লোচনদাস ছিলেন চৈতন্যজীবনীকার। তিনি কিছু বৈষ্ণব পদ রচনা করেছিলেন। তাঁর গুরু ছিলেন নরহরি সরকার। লোচনদাস গৌরি নাগর ভাবের অনেকগুলো আদিরসাত্মক পদ রচনা করেছিলেন। ড. অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়ের মতে, লোচনদাস মাত্রা ছাড়িয়ে কটু আদি রসের ভিয়ান চড়িয়ে শৃঙ্গার উদ্বোধক ধামালির চটুল ছন্দে নদীয়া-নাগরীগণের গৌরাঙ্গ-আকাঙ্ক্ষা বর্ণনা করেছেন।

বৈষ্ণব পদাবলির রস

বৈষ্ণব সাহিত্যের রস পাঁচটি:

১. শান্ত রস ২. দাস্য রস ৩. সখ্য ৪. বাৎসল্য রস ৫. মধুর রস বা শৃংগার রস।

বৈষ্ণব সাহিত্যের উৎকৃষ্ট রস হচ্ছে মধুর রস বা শৃংগার রস।

ব্রজবুলি

'ব্রজবুলি' হলো মৈথিলি ও বাংলা ভাষার মিশ্রণে গঠিত একপ্রকার কৃত্রিম কবিভাষা। বৈষ্ণব পদাবলির আদি রচয়িতা মিথিলার কবি বিদ্যাপতি (১৩৮০-১৪৬০ খ্রিঃ মতান্তরে ১৩৯০-১৪৯০ খ্রিঃ) ছিলেন পদাবলির বিখ্যাত কবি। তিনি ব্রজবুলি ভাষায় প্রথম পদাবলি রচনা করেন। উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ব্রজবুলি ভাষায় ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলি' নামে কাব্য রচনা করেন।

ব্রজবুলি ভাষার বৈশিষ্ট্য:

১. তিনটি শ, ষ, স এর পরিবর্তে একটি মাত্র 'স' এর ব্যবহার।
২. ব্যঞ্জনধ্বনি বর্জন ও স্বরধ্বনির ব্যবহার প্রবণতা।
৩. অ-আ, ই-ঈ, উ-ঊ এর হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণে ও লিখিত বানানে খুবই শৈথিল্য ছিল।
৪. য এবং ব এর অন্তস্থ 'ইয়', 'ওয়া' উচ্চারণ লোপ পেয়েছে।
৫. ভিন্ন দুই যুক্ত ব্যঞ্জন অনেক সময় এক ব্যঞ্জনের দ্বিত্বে রূপান্তরিত হয়েছে।
৬. অনেক সময় দুই যুক্ত ব্যঞ্জনের একটি লোপ পেয়েছে।
৭. ধ্বনি পরিবর্তনের, বিশেষ করে বিপ্রকর্ষ ও স্বরসংগতির যথেষ্ট উদাহরণ মিলে।
৮. আনুনাসিক উচ্চারণ কম।
৯. সম্প্রদান পৃথক রূপ নেই।
১০. সমাসবদ্ধ বিভিক্তিহীন সম্বন্ধ পদের যথেষ্ট ব্যবহার।
১১. তৎসব ও তদ্ভব শব্দই বেশি ব্যবহৃত।

বিগত BCS প্রশ্নাবলী

০১) বাংলা সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য দেবের ভূমিকা পর্যালোচনা করুন। (৩৫তম BCS)
০২) জীবনীসাহিত্য বলতে কী বোঝেন? (৩০তম BCS)
০৩) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চৈতন্যদেব কেন স্মরণীয়? (২৯তম BCS)

আলোচ্য বিষয়

মধ্যযুগের সাহিত্য: শ্রীচৈতন্য দেব ও জীবনী সাহিত্য: গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

০১) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চৈতন্যদেব কেন গুরুত্বপূর্ণ?
০২) শ্রীচৈতন্যদেবকে নিয়ে লেখা দুইটি জীবনীকাব্যের নাম লিখুন।
০৩) 'ষড়গোস্বামী' কাদেরকে বলা হয়?
০৪) কড়চা কী? আলোচনা করুন।

STUDENT STUDY মধ্যযুগের সাহিত্য: শ্রী চৈতন্য দেব ও জীবনী সাহিত্য

চৈতন্য জীবনকথা

শ্রীচৈতন্যদেব ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে ১৮ ফেব্রুয়ারি শনিবার নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে পুরিতে মারা যান। তাঁর পিতা জগন্নাথ মিশ্র সিলেট জেলার ঢাকা দক্ষিণ গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি সিলেট থেকে নবদ্বীপে যান এবং শচীদেবীকে বিয়ে করে সেখানেই বসবাস করেন। তখন নবদ্বীপ ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র-সংস্কৃতি, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য চর্চার কেন্দ্র এবং ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রবিদ ও সমাজপতিদের নিবাস ছিল। একারণে সিলেট থেকে জগন্নাথ মিশ্র ও আরও অনেকে এসে নবদ্বীপে বাস করছিলেন।

চৈতন্যের বাল্য নাম ছিল নিমাই, দেহবর্ণের জন্য নাম হয় গোরা বা গৌরাঙ্গ, তাঁর প্রকৃত নাম ছিল বিশ্বম্ভর, সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য– সংক্ষেপে 'চৈতন্য' নামে পরিচিত হন। চৈতন্যদেবের জীবনীকার বৃন্দাবনদাসের মতে, তিনি জগতকে কৃষ্ণনাম বলিয়েছেন, কৃষ্ণের কীর্তন প্রকাশ করেছেন, তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। আবার জয়ানন্দের মতে, কৃষ্ণই চৈতন্যসন্ন্যাসী হয়ে জগতকে চৈতন্য দান করেছেন, তাই তাঁর নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

চৈতন্যদেব বাল্যকালে অত্যন্ত চঞ্চল প্রকৃতির ছিলেন। গঙ্গার ঘাটে স্নান-উপাসনারত ব্রাহ্মণ-ভক্ত নরনারীকে বিব্রত করায় তিনি আনন্দ পেতেন। পরিণত বয়সেও তিনি অপরকে পরিহাস ও উত্যক্ত করে আনন্দ পাবার অভ্যাস ত্যাগ করেননি। বড় ভাই বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন বলে তাঁরও সন্ন্যাসী হওয়ার আশঙ্কায় লেখাপড়া থেকে তাঁকে প্রথমত বঞ্চিত রাখা হয়। পরে নিজের আগ্রহাতিশয্যে তিনি বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ লাভ করেন। তিনি যৌবন সর্বাগ্রগণ্য পণ্ডিত হয়ে উঠেছিলেন এবং টোল খুলে শিক্ষাদানের কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। ব্যাকরণশাস্ত্রে তিনি প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। সন্ন্যাসপূর্বকালে তিনি ন্যায়শাস্ত্রের একটি টীকা রচনা করেছিলেন বলে জনশ্রুতি আছে। গঙ্গার ঘাটে বল্লভ আচার্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবীকে দেখে তাঁকে বিয়ে করেন। তাঁর প্রথমা পত্নী লক্ষ্মীদেবী বিয়ের অল্পদিন পরেই সর্প দংশনে মারা যান। মায়ের পীড়াপীড়িতে তিনি পুনরায় বিয়ে করেন। তাঁর এ পত্নীর নাম ছিল বিষ্ণুপ্রিয়া। ২৩ বৎসর বয়সে গয়ায় পিতৃপিণ্ড দান করতে গিয়ে তিনি প্রখ্যাত বৈষ্ণবভক্ত ঈশ্বর পুরীর সাক্ষাৎ পান এবং তাঁর নিকট তিনি দীক্ষা নেন। দীক্ষার পর তিনি ভবগত প্রেমে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন; প্রেমের মন্ত্র তার জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল।

২৪ বৎসর বয়সে তিনি কাটোয়ার কেশব ভারতীয় কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য– সংক্ষেপে শ্রীচৈতন্য নামে খ্যাত হন। তখন অদ্বৈত আচার্য, নিত্যানন্দ প্রমুখ ভক্তরা তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। তারপর চৈতন্যদেব পুরিতে নীলাচলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি কয়েকবার বিভিন্ন স্থান ঘুরে বেড়ান। দাক্ষিণাত্য, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, গৌড় ইত্যাদি স্থান পরিভ্রমণ করে তিনি দু বছর কাটান। এই দীর্ঘ কাল তীর্থাদি পর্যটনের ফলে তিনি বহু সাধু-সন্ন্যাসী পণ্ডিত-দার্শনিকের সান্নিধ্যে আসেন এবং তাঁর প্রেমধর্মের উৎকর্ষ প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সময়ে অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি তাঁর কাছে দীক্ষা নেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন গৌড়ের সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের বিশিষ্ট কর্মচারী সাকর মল্লিক ও দবীর এবং খাস পদে অধিষ্ঠিত রূপ ও সনাতন। জীবনের শেষ আঠার বছর চৈতন্যদেব পুরি ছেড়ে অন্য কোথাও যাননি। অধিকাংশ সময় তিনি কৃষ্ণপ্রেমের দিব্যভাবে বিভোর হয়ে থাকতেন। তখন শ্রীকৃষ্ণলীলার কীর্তনে, গানে ও প্রেম উচ্ছ্বাসে তাঁর সময় অতিবাহিত হত। নীলাচল বাসের বিশ বছর অন্তরঙ্গ লীলারসে অসংখ্য ভক্তচিত্তকে আনন্দ মথিত করে তোলেন, সেই সঙ্গে তিনি মধুরকণ্ঠের সুললিত নাম সংকীর্তনে সারাদেশকে করেছিলেন পরিপ্লাবিত। ৪৮ বৎসর বয়সে তিনি পুরীতেই দেহত্যাগ করেন। জীবনের শেষ বারো বছর তিনি প্রায়ই বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় থাকতেন।

ষড়গোস্বামী

'বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামী' নামে পরিচিত চৈতন্যদেবের ছয় জন প্রখ্যাত শিষ্য বৃন্দাবনে অবস্থান করে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে গেছেন। তাঁরা হলেন: সনাতন গোস্বামী, রূপ গোস্বামী, জীব গোস্বামী, রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও গোপাল ভট্ট। প্রথমোক্ত তিন জন বৈষ্ণবশাস্ত্র রচনায় এবং শেষোক্ত তিন জন বৃন্দাবনে বৈষ্ণব সমাজের প্রতিষ্ঠা করে সারা বাংলাদেশে বৈষ্ণবশাস্ত্র প্রচারের ব্যবস্থা করেন। বাঙালি বৈষ্ণব সমাজে কৃষ্ণলীলার দর্শন ও তত্ত্ব প্রচারে এই ষড়গোস্বামী বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। বৈষ্ণব শাস্ত্রও এই ষড়গোস্বামীর হাতেই গড়ে উঠেছিল। কারণ চৈতন্যদেব কোন গ্রন্থ রচনা করে যায়নি এবং ভক্তদের জন্য নির্দিষ্ট কোনো শাস্ত্রও তৈরি করেননি। তাঁদের ছাড়া আরও অনেক বৈষ্ণব মহাজন পদাবলি ও জীবনী রচনায় বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এর ফলে বৈষ্ণব পদাবলি রচনায় ব্যাপকতা ও উৎকর্ষের সৃষ্টি হয়েছে এবং জীবনী সাহিত্য রচনাতেও কবিত্বশক্তি নিয়োজিত হয়েছিল।

বাংলা সাহিত্যে চৈতন্য প্রভাব

শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর জীবিতকালেই ভক্তদের কাছে ভগবানের অবতার বলে গৃহীত হয়েছিলেন। তাঁর সান্নিধ্যে এসে অনুসারীরা প্রেমধর্মে দীক্ষিত হয়। মুসলমান শাসন ও ইসলাম ধর্মের সম্প্রসারণের প্রেক্ষিতে তৎকালীন হিন্দু সমাজে যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছিল তাকে প্রতিরোধ করার মন্ত্র ছিল শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত বৈষ্ণব মতবাদের মধ্যে। মুসলমান শাসনামলে পীর দরবেশের প্রভাবে অনেক হিন্দু ও বৌদ্ধ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। হিন্দু সমাজের এই ধ্বংসোন্মুখ প্রবণতা রোধ করার জন্য চৈতন্যদেব ও তাঁর শিষ্যগণ ধর্মীয় তৎপরতা দেখিয়েছিলেন।

চৈতন্য প্রবর্তিত আবেগমূলক বৈষ্ণবধর্ম বাঙালির চিন্তাপ্রণালীর পরিবর্তন সাধন করে এবং এ পরিবর্তন শুধু জীবন ও ধ্যানধারণার ক্ষেত্রেই আসেনি, বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও চৈতন্যপ্রভাব অবিস্মরণীয় ঘটনারূপে পরিগণিত হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে যে বিপ্লব সাধিত হয়েছিল সেদিক বিবেচনায় কোনো কোনো পণ্ডিত মধ্যযুগকে শ্রীচৈতন্যপূর্ব ও শ্রীচৈতন্যপরবর্তী যুগে বিভক্ত করার প্রয়াস পেয়েছেন।

রাধার আধ্যাত্মমূর্তির মহিমাময় পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে। তাই চৈতন্য-পূর্ব ও চৈতন্য-পরবর্তী পদাবলি সাহিত্যে একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। রাধাকৃষ্ণ প্রেমকাব্যকে আধ্যাত্মিকতার দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করা হয়েছে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরিণাম হিসেবে। শ্রীচৈতন্যের দিব্যভাব ও আচরণে এবং তাঁর পরমভক্ত ও পরম জ্ঞানীগুণীর ধ্যান-মননের মধ্যে রাধার এক নতুন রূপ উপলব্ধি করা যায়। এই কারণে বৈষ্ণব সাহিত্যে আধ্যাত্মরস ও কাব্যরসের সম্মিলন ঘটেছে।

চৈতন্যদেবের প্রভাবে এদেশে যে নবজাগরণ দেখা দিয়েছিল তাকে কেউ কেউ 'চৈতন্য-রেনেসাঁ' বলে অভিহিত করেছেন। বাংলা সাহিত্যে এই নবজাগরণের নির্দশন বিদ্যমান। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, 'চৈতন্যের প্রভাবেই বাংলা সাহিত্য তুচ্ছ মঙ্গলকাব্য ও নাথসাহিত্যের রহস্যময় 'কাল্ট' হইতে মুক্তি পাইয়া উদারতার পরিমণ্ডলে সম্প্রসারিত হইল।'

চৈতন্য-জীবনচরিতগুলো বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করলেও চৈতন্যপ্রভাবের সর্বোৎকৃষ্ট ফসল পদাবলি সাহিত্য। চৈতন্যপ্রভাবেই বাংলা ভাষা গোঁড়া ব্রাহ্মণের নিকটও সংস্কৃতের ন্যায় আদরণীয় হয়ে ওঠে। বৈষ্ণব পদাবলি ও জীবনী সাহিত্য মধ্যযুগের সাহিত্যকে গতানুগতিকতার ধূলিধূসর পথ থেকে প্রেমসৌন্দর্য ও আধ্যাত্মলোকের আলোকতীর্থে নিয়ে গেছে।

শ্রীচৈতন্যের প্রভাব সম্পর্কে ড. আহমদ শরীফ 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য' গ্রন্থে লিখেছেন, 'চৈতন্যদেবের বড় অবদান হচ্ছে সুফীমতের প্রভাবে ভক্তিধর্মকে প্রেমধর্মে উন্নীত করা।' চৈতন্যদেবের ভক্ত ও অনুসারীগণের মধ্যে অনেক জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরা পরবর্তী এক শ বছর বৈষ্ণব মতবাদে উদ্বুদ্ধ বাঙালি সমাজকে প্রাণরসে উজ্জীবিত রেখেছিলেন। চৈতন্যদেব সংস্কৃত কবি জয়দেব, মৈথিলি কবি বিদ্যাপতি ও বাঙালি কবি চণ্ডীদাসের পদাবলি শুনতে পছন্দ করতেন।

জীবনীসাহিত্য ও চৈতন্যদেব

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের গতানুগতিক ধারায় জীবনীসাহিত্য এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁর কতিপয় শিষ্যের জীবনকাহিনি অবলম্বনে এই জীবনীসাহিত্যের সৃষ্টি। তবে এর মধ্যে চৈতন্য জীবনীই প্রধান। চৈতন্যদেব জীবিতকালেই কারও কাছে অবতাররূপে পূজিত হন। তাঁর শেষজীবন দিব্যোন্মাদ রূপে অতিবাহিত হয়েছে বলে তাঁর পক্ষে ধর্মমত প্রচার করা সম্ভব হয়নি। তাঁর শিষ্যরা এ দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ধর্মপ্রচার করতে গিয়ে তাঁরা শ্রীচৈতন্যের জীবনকাহিনি আলোচনা করতেন। চৈতন্যের জীবদ্দশায়ই সংস্কৃত শ্লোকে, কাব্যে ও নাটকে এবং বাংলা গানে ও কাব্যের তাঁর চরিত্রকথা স্থান পেয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর জীবনী সাহিত্য সৃষ্টিতে প্রাচুর্য এসে বাংলা সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্য এনেছে। বৈষ্ণব জীবনী সাহিত্যেই রক্ত-মাংসের মানুষ সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যে একক প্রসঙ্গ হয়ে আত্মপ্রকাশ করল।

ধর্মীয় বিষয় অবলম্বনে সাহিত্যসৃষ্টি মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্য। চৈতন্য জীবনী সাহিত্যও এই বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত নয়। কারণ চৈতন্যদেবকে অনেকেই অবতার হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন এবং তাঁকে অবলম্বন করে রচিত কাব্য ভক্তিকাব্য হয়ে পড়েছে। ভক্তেরা চৈতন্যদেবকে মানুষরূপে কল্পনা করেননি। করেছেন নররূপী নারায়ণরূপে।

চৈতন্য জীবনের কাহিনিতে অলৌকিকতা আরোপ করেছেন। তবু চৈতন্য ও তাঁর শিষ্যরা বাস্তব মানুষ ছিলেন এবং এ ধরনের বাস্তব কাহিনি নিয়ে সাহিত্যসৃষ্টি বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম। এ পর্যন্ত রচিত বাংলা সাহিত্যের বিষয় ছিল পৌরাণিক গল্প, দেবতার মাহাত্ম্যকাহিনি ও রাধাকৃষ্ণ

লীলাবিষয়ক পদাবলি। কিন্তু জীবনী সাহিত্যে সমকালীন ইতিহাস প্রতিফলিত হয়েছে। বাস্তব মানুষের জীবনকাহিনি সাহিত্যের উপজীব্য হয়ে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে।

জীবনী সাহিত্যের রচয়িতাগণের উদ্দেশ্য ছিল চৈতন্যদেবের মহান জীবনকাহিনি বর্ণনার মাধ্যমে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের গৌরব প্রতিষ্ঠা করা। ফলে এতে অনেক অলৌকিক ঘটনা অলঙ্কার সহকারে বর্ণিত হয়েছে। বিভিন্ন চৈতন্য জীবনী গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যদেবের নামে বর্ণিত অলৌকিক ঘটনাগুলো ছিল এরকম: বৌদ্ধভিক্ষুর মস্তক কর্তন ও পুনঃসংযোজন, কাশী মিশ্র ও প্রতাপ রুদ্রকে চতুর্ভুজ মূর্তি প্রদর্শন, ভাবাবিষ্ট চৈতন্যের এক হস্তের দীর্ঘীভবন, সর্বদ্বার রুদ্ধ গৃহ থেকে চৈতন্যের নিষ্ক্রমণ ইত্যাদি।

এর জন্য অনেকে এগুলোকে যথার্থ জীবনী হিসেবে গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক। জীবনীকারগণ চৈতন্যকে স্বয়ং কৃষ্ণ প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। কেউ কেউ তাঁর ভাবজীবনের তাৎপর্য বোঝানোর জন্য বাস্তব ঘটনাকে অলৌকিকতার স্পর্শ দান করেছেন। এতে চরিত্রগুলোতে অলৌকিকতা ও অতিরঞ্জন স্থান পেয়েছে। সেই জন্য কারও কারও মতে চৈতন্য জীবনীগুলোকে চরিত্রকথা হিসেবে মূল্যবান দলিল স্বরূপ গণ্য করা চলে না, বরং ভক্ত কবিগণ ভক্তির প্রাবল্যে 'চরিতামৃত' রচনা করেছেন।

চৈতন্যজীবনীর ভক্ত কবিগণ তাঁদের তত্ত্বালোচনায় ও কাব্যরূপায়ণে শ্রীরাধা এবং শ্রীচৈতন্যকে অনেক ক্ষেত্রে অভিন্ন কল্পনা করেছেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর গৌর অঙ্গে অরুণ বর্ণের বসন ধারণ করে চৈতন্যদেব দেহমনে যেন রাধারূপ লাভ করেছিলেন। পরবর্তীকালে প্রেমোন্মাদ দশায় তাঁর আচরণ প্রেমোন্মদিনী রাধার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের এই সব জীবনী সাহিত্যের গুরুত্ব অত্যধিক। তৎকালীন বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের উপকরণ হিসেবে জীবনী সাহিত্যের বিশেষ গুরুত্ব অবশ্যস্বীকার্য। ধর্মীয় চেতনার জীবনীগুলো ভক্তদের কাছে সমাদৃত, কাব্যগুণের জন্য তা পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করে আর তৎকালীন সমাজ ও ইতিহাসের তথ্যের জন্য ঐতিহাসিকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়ে থাকে।

শ্রীচৈতন্যদেবের সংস্কৃত জীবনী

চৈতন্যদেবের প্রথম জীবনী সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়। নরহরি সরকার, রঘুনাথ দাস প্রমুখেরা চৈতন্যবিষয়ক পদ রচনা করেছিলেন। তবে চৈতন্যের প্রথম জীবনী লেখক হিসেবে মুরারি গুপ্ত কৃতিত্বের অধিকারী। 'মুরারি গুপ্তের কড়চা' নামে পরিচিত তাঁর কাব্যের প্রকৃত নাম 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্'। মুরারি গুপ্ত মূলত সিলেটের অধিবাসী ছিলেন এবং পরে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যের সহাধ্যায়ী ছিলেন। মুরারি গুপ্তের গৃহে চৈতন্যের প্রথম ভাবাবেশ ঘটেছিল বলে জনশ্রুতি বিদ্যমান। তিনি চৈতন্যের সমসাময়িক ছিলেন বলে অধিকাংশ ঘটনা নিজেই প্রত্যক্ষ করেছেন। কবি মুরারি গুপ্ত চৈতন্য জীবনের প্রথম দিকের সন্ন্যাস জীবন পর্যন্ত বর্ণনা করেছিলেন। তাঁর কাব্যের মধ্য ও শেষ লীলা অন্যের রচনা।

মুরারি গুপ্ত কেবল প্রথম চৈতন্য-জীবনী লেখকই নন, তিনি চৈতন্য-জীবনী রচনার অবিতর্কিত আদর্শের প্রবর্তনকারী। ড. বিমানবিহারী মজুমদারের মতে, মুরারি গুপ্তের গ্রন্থের রচনাকাল ১৫৩৩ থেকে ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। কবি কর্ণপুর, বৃন্দাবনদাস, লোচনদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রমুখ কবিগণ মুরারি গুপ্তের কাছে বহুলাংশে ঋণী।

কড়চা

চৈতন্যদেবের জীবনীগ্রন্থকে 'কড়চা' নামে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন: মুরারি গুপ্তের কড়চা, স্বরূপ দামোদরের কড়চা, গোবিন্দদাসের কড়চা প্রভৃতি। কড়চা কথাটির প্রয়োগ সম্পর্কে ড. সুকুমার সেন লিখেছেন, 'কড়চা শব্দটি আসিয়াছে প্রাকৃত 'কটকচ্চ', সংস্কৃত 'কৃতকৃত্য' হইতে। 'কট' শব্দ প্রাচীন অনুশাসনে 'খসড়া লেখা' (Original draft) অর্থেই পাওয়া গিয়েছে। কড়চার অর্থও এই ব্যুৎপত্তির অনুরূপ– খসড়া রচনা, স্মারক লিপি, সংক্ষিপ্ত বক্তব্য।' কড়চাকে দিনপঞ্জি বা রোজনামচা হিসেবে বিবেচনা করা চলে। এতে লেখক নিজের জীবনের ঘটনা বা তাঁর দেখা বা শোনা ঘটনার বিবরণ প্রতিদিন রাখতেন। পরবর্তীকালে কোনো রচনার উপকরণ হিসেবে তা ব্যবহৃত হত। তবে চৈতন্য জীবনীকে কড়চা নামে অভিহিত করাতে কথাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

শ্রীচৈতন্যদেবের বাংলা জীবনী

চৈতন্যদেবের বাংলা জীবনীকাব্যগুলো বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের ইতিহাসের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

বৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্যভাগবত

বাংলা ভাষায় শ্রীচৈতন্যের প্রথম জীবনীকাব্য বৃন্দাবনদাসের 'শ্রীচৈতন্যভাগবত'। কবি সম্ভবত ১৫১৮ খ্রিস্টাব্দের কাছকাছি সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর কাব্য প্রথমত 'চৈতন্যমঙ্গল' নামে পরিচিত ছিল, পরে এ কাব্যে ভাগবতের প্রভাব ও লীলা-পর্যায় দেখে এর নাম চৈতন্যভাগবত রাখা হয়। কাব্যটির রচনাকালে সম্ভবত ১৫৪৮ খ্রিস্টাব্দে। এ কাব্য রচনায় কবি বৃন্দাবনদাস তাঁর গুরু নিত্যানন্দের কাছ থেকে অধিকাংশ উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। কবির আমলে জীবিত এমন অনুচরদের কাছ থেকেও তিনি তথ্যাদি পেয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি ভাগবত থেকেও উপকরণ নিয়েছিলেন।

লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল

কবি লোচনদাস তাঁর গুরু বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট নেতা নরহরি সরকারের আদেশে ১৫৫০ থেকে ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে চৈতন্যমঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন। কবি এ কাব্য রচনায় মুরারি গুপ্তের কড়চার সহায়তা নিয়েছিলেন।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল

কবি জয়ানন্দের আনুমানিক ১৫১৩ খ্রিস্টাব্দের বর্ধমানে জন্মগ্রহণ করেন। সম্ভবত ১৫৬০ সালের দিকে কবি চৈতন্যমঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন। জনসাধারণের জন্য গতানুগতিকভাবে কাব্যটি রচিত বলে এতে ঐতিহাসিক তথ্যের সঙ্গে অনৈক্য প্রকাশ পেয়েছে। এ কাব্যের রচনারীতি মঙ্গলবাক্য ও পৌরাণিক ধরনের। এই কাব্যটির বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব সকল প্রকার পাঠক-শ্রোতার উদ্দেশ্যে রচিত।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যরচরিতামৃত

কৃষ্ণদাস আনুমানিক ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমান জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চৈতন্যসহচর নিত্যানন্দ কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে বৃন্দাবনে আসেন এবং সেখানে তিনি রূপ সনাতন প্রমুখ চৈতন্য অনুচরগণের সাক্ষাৎ পান। এখানেই তিনি বৈষ্ণব আচার্যগণের সহায়তায় যাবতীয় ভক্তিশাস্ত্র ও বৈষ্ণব সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। তিনি পাণ্ডিত্য ও রসবোধ সে আমলে অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হন। বৃন্দাবনে বৈষ্ণব আচার্য ও গুরুদেব অনুরোধে কবি সম্ভবত ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দে বৃদ্ধাবস্থায় এ কাব্য রচনা করেছিলেন।